Indian Science News Association
ESTD.–1935

বিজ্ঞান কথন

কলকাতা/ এপ্রিল ২২, ২০২২, শুক্রবার, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

বি P V প্র

আত্মমন্থন

গত বছর মহাজ্ঞানী মহাজনদের আশীর্বাদ এবং আপনাদের শুভেচ্ছা পাথেয় করে যখন আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম তখন আমরা স্থির করেছিলাম আমাদের এই পত্রিকায় যেন কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিফলন না ঘটে।

কিন্ত আজ বোধহয় সেই সিদ্ধান্ত পুণর্বিবেচনার সময় এসেছে। কারণ রাজ-নীতির সর্বময় অনুপ্রবেশ। রাজনীতি কোথায় নেই? কাছে, দূরে, এমনকি আন্তর্জাতিক আ-ঙিনায়। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে রাজনীতি ঢুকে পড়েছে এবং পড়ছে। এমনকি বিজ্ঞানেও। এখনতো আবার বিজ্ঞানকে ধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ারও অনর্গল প্রচেষ্টা চলছে।

সন্দেহ নেই, এতে প্রভাবিত হচ্ছি আমরা সবাই। কিন্ত সবথেকে বেশি প্রভাব পড়ছে বোধহয় শিশু মনের ওপর। ইউক্রেন যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে কতদিন হয়ে গেল! পৃথিবীখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা সায়েন্টিফিক আমেরিকান এই যুদ্ধের ফলে অসংখ্য নির-পরাধ শিশুমৃত্যুর পর একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে শিশু মনে এর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সবথেকে বেশি। অসহায় শিশু জানেনা যুদ্ধ কি, অস্ত্রশস্ত্রই বা কি? সে প্রশ্ন করতে চাইছে। এদিকে বোমার আঘাতে তার বাসস্থান গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। ভীরু মা তাকে কোলে নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছেন। কিন্ত উত্তর পাওয়ার আগেই তাঁর ক্রোড়স্থ শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে বা ধ্বংস স্তুপের তলায় তাঁরা দুজনেই চাপা পড়ছেন।

কতদিন এই ধ্বংসযজ্ঞ চলবে তা আমরা জানিনা। কেন এই অবাঞ্ছিত মৃত্যু তার কারণ অনুসন্ধানেও আমরা যাচ্ছি না। সে উত্তর দেওয়ার জন্য রয়েছেন প্রথিতযশা সা-ংবাদিকেরা, রাজনৈতিক নেতারা, এমন কি নামী দামী অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। সবাই জানেন এখন রাজনীতি পরিচালিত হয় অর্থনীতির দ্বারা। ইউক্রেন যুদ্ধের পিছনেও হয়তো অর্থনীতির ছায়া রয়েছে। আমরা সে বিতর্কেও যাবনা। ঐ পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী যে শিশুরা বেঁচে থাকবে, হয়তো বিকলাঙ্গ বা সীমিত বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে, তারা ভবিষ্যতে কি ভাবে থাকবে প্রশ্নটা সেইখানেই। হিরোশিমা, নাগাসাকির কথা আমরা এখনও ভুলতে পারিনি!

তেমনি সাম্প্রতিক শিরোনামে উঠে এসেছিল পেগাসাস নামে গুপ্তচর বৃত্তির একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা যা একটি ছোট দেশের অত্যাশ্চর্য বৈজ্ঞানিক আবিস্কার। পৃথিবীর বহু দেশেই এই ব্যবস্থাটি রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিত নড়িয়ে দিতে সক্ষম।

আমাদের দেশেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। রাজনৈতিক নেতারা জ্বালাময়ী বিবৃতি দিয়েছেন, বাকযুদ্ধে মেতেছেন। কে বা কারা, এই অনুসন্ধানে আমাদের প্রয়োজন নেই। এমনিতেই অন্তর্জালের দৌলতে যোগাযোগ জগতে বিশাল বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা শুধু বলতে পারি এই বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারটির কথা যার প্রয়োগ ক্ষমতা সীমাহীন।

তেমনই বিজ্ঞানের আর একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির অন্যতম ধারা ফরেনসিক সায়েন্স। কোন অপরাধ সংঘটিত হলেই সেখানে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের অনবরত ডাক পড়ে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নমুনা থেকে তাঁরা তাঁদের বিশ্লেষণের যার মধ্যে কার্বন ডেটিংও রয়েছে - মাধ্যমে বহু অভাব-নীয় অপরাধের কিনারা করিয়ে দেন। রাজনৈতিক বিতর্ক তখনই বাধে যখন অপরাধের সাক্ষ্য প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা হয়। এতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা ব্যহত হয়। এখানেও সেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি রোধ করার অপচেষ্টা!

অপবিজ্ঞান যেমন বিজ্ঞান নয়, তেমনই বিজ্ঞানের অপব্যবহারকেও বিজ্ঞান বলা চলেনা। Little fat boy এর জনক ওপেন-হাইমারও তাঁর মহাশক্তিধর আবিষ্কারের অপপ্রয়োগ দেখে শিউরে উঠেছিলেন। জাতে জার্মান, এই মহাবিজ্ঞানী মর্মবেদনায় আবৃত্তি করেছিলেন ভগবদগীতার ৩২তম পংক্তিঃ Now, I am become Death, the de-stroyer of world! বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অপপ্রয়োগের পর এই মর্মান্তিক অনুভূতি বোধহয় একজন বিজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তার পক্ষেই সম্ভব। বিজ্ঞান ও দর্শনের কি অভাবনীয় মেলবন্ধন!

ঘরে বাইরে সামগ্রিক এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আজ এসব কথা বোধহয় নতুন করে সবাইয়ের ভাবার সময় এসেছে।

boseprasanta@hotmail.com
arnab_jour@yahoo.co.in

পৃথিবী বদলে গেছে

তুহিন সাজ্জাদ সেখ: এহেন উন্নয়নশীল গোটা বিশ্বে বোকা কে?

--- না মানছি কালিদাস যে গাছের ডালে বসে ছিলেন সেই ডালই তিনি কাটছিলেন --- তবে আজকে তিনি বোকা নন। তিনি একজন মহাকবি। তাহলে বোকা কে?

আমার মনে হয় তিনিই বোকা যিনি নির্বিচারে গাছ কাটেন। যিনি নিজের সাম-য়িক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে অবলীলায় গাছপালা,বনবাদাড়, ঝোঁপ ঝাড় কেটে ফেলেন তিনিই আসল বোকা!

প্রায় পাশবিকতার হাত ধরে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো সুস্থ পরিবেশের বুক ক্ষতবিক্ষত করেই চলছে নিরন্তর বননিধন, জলাভূমি ভরাট, প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়, রাসায়নিক সারের ব্যবহার,প্লাস্টিকের দৌরাত্ম্য, জীবাশ্মের যন্ত্রণা,গাড়ি ও কলকারখানার ধোঁয়ার জ্বলুনি, কীটনাশকের

Source.www.google.com

উস্কানি, আমিষের ভূরিভোজ এবং শেষমেষ জলের শ্রাদ্ধ! পৃথিবী বদলে যাচ্ছে....ক্রমশ.... আরও ভয়াবহতার দিকে! উন্নয়নের নামে চলছে পরিবেশের ধ্বংস সাধন।

উন্নয়ন হচ্ছে পরিবেশ ও কালের সাথে পরিবর্তনশীল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বিশ্বায়নের আবহে গোটা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে উৎপাদন বনাম বন্টন, কৃষি বনাম শিল্পোন্নয়ন, শহরাঞ্চল বনাম গ্রামীণ উন্নয়ন, পুঁজিনিবিড় বনাম শ্রমনিবিড় উন্নয়ন, আর্থসামাজিক বনাম প্রকৃত পরিকল্পনা, কেন্দ্রীকরণ বনাম বিকেন্দ্রীকরণ, আধুনিক বনাম লোকায়ত উন্নয়নের নানা অভিমুখ ও দ্বন্দ্ব। সারা বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নয়নের প্রয়োগ-প্রকৃতি নিয়ে রয়েছে নানা সব বিতর্ক।আর এর ফলেই ধরিত্রীর বাস্তুতন্ত্র সুস্থায়ী হতে পারছে না, ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। তাজ্জব ব্যাপার গোটা বিশ্বে অর্থনৈতিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত নিউক্লিয়ার পরিবারের মানুষ এখন "নিউক্লিয়ার সংযোজন/ বিয়োজন" নামক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর হাত ধরে এই সুন্দর সৃষ্টিকে শেষ করার মাদক নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছে। একবার বোতাম টিপলেই হল আরকি--- মুহূর্তেই সব শেষ! আসলে প্রযুক্তিকে উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করলেও যদি সম্পদের অতিব্যবহার ও পুনর্নবীকরণের সুযোগ না থাকে তাহলে কখনোই উন্নয়ন সুস্থায়ী হবে না।

>>৮

নব বেহুলার গল্প

প্রশান্ত কুমার বসু: তা ধরেন এই বাগবাজার থেকে ওদিকে শোভাবাজার, এদিকে টালা ব্রিজ, আর ওদিকে হাথিবাগান আর সামনে উল্টাডাঙ্গা। এতো বড় হল আমাদের গ্রাম। নাম রঘুনাথপুর, জিলা বেগু-সরাই। খুব বড় গ্রাম আছে, রাজা ভি আছেন। নাম রাজিন্দর যাদব।

হাঁ উনি ভি যাদব। তা ধরেন ওর জমিন করিব পাঁচ হাজার বিঘা তো হোবেই। গ্রামে আমরা পচাস সাট ঘর যাদব আছি। আমরা ওকেই রাজা মানি। রাজার আরও জমিন আছে, ছাপরা, ভাগল-পুর, মুঙ্গের, আরা, বালিয়া এই সব জিলায়। গ্রামে আমাদেরও জমিন আছে, গাই ভি আছে। হামার একটা গাই ছিল। তা আপনার পন্দর সোল কিলো অবধি দুধ দিতো।

.>>৮

কেমন করে এল এই ধরিত্রী দিবস?

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়: পৃথিবী দিবস, ধরিত্রী দিবস বা বসুন্ধরা দিবস, যে নামেই আর্থ ডে-কে বাংলায় ডাকুন না কেন এই দিবসের ইতিহাস কতটুকু জানেন? ১৯৭০এ আমেরিকায় উদযাপিত জাতীয় একটি দিবস তার দু'দশক পরে আন্তর্জাতিক দিবসে রূপান্তরিত। কিভাবে ঘটল এই রূপান্তর? চট করে দেখে নেওয়া যাক সেই ইতিহাস।

কেউ কেউ মনে করেন, পৃথিবী দিবসের যে ভাবনা

Source.www.google.com

প্রকৃতপক্ষে তার প্রেরণা আসে ১৯৬২তে প্রকাশিত র‍্যাচেল কারসনের সাইলেন্ট স্প্রিং বই থেকে, যে বইতে লেখিকা তুলে ধরেছিলেন ডি ডি টি-র মত রাসায়নিক কীটনাশক কিভাবে পরিবেশের ক্ষতি করে। পরিবেশ চেতনার সেই ভাবনার ধারাবাহিকতাতেই হয়ত ১৯৬৯-৭০ সালে এই বিশ্বকে বাঁচানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়। ওইসময় আমেরিকার সঙ্গে ভিয়েতনামের যুদ্ধ চলছিল। সেই যুদ্ধে আমেরিকার পরাজয়, সামগ্রিকভাবে যুদ্ধের নানান ক্ষয়-ক্ষতির ফলে আমেরিকায় যুদ্ধ-বিরোধী জনমত গড়ে উঠছিল। শুরু হচ্ছিল শান্তিবাদী আন্দোলন। আমেরিকার এক শান্তিবাদী জন ম্যাককনেল পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বব্যাপী একটি দিন উদযাপনের কথা ভাবেন তবে তা বাস্তবায়িত হতে পারে নি।

ইতিমধ্যে ১৯৬৯এর জানুয়ারিতে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারায় সমুদ্রে খনিজ তেল পড়ে মারাত্মক দূষণ ঘটে। পরিবেশের এই ক্ষতির ফলে পরিবেশ বাঁচানোর ভাবনা দানা বাঁধতে থাকে সে-দেশে। এগিয়ে আসেন উইস্কন্সিনের সেনেটর গেলর্ড নেলসন, সঙ্গে পান মার্কিন কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্য প্যাট ম্যাককুস্কিকে। তাঁরা আমে-রিকার ছাত্র-যুবদের ডাক দেন এগিয়ে আসতে। ঠিক হয় ২২ এপ্রিল দিনটি পালিত হবে পৃথিবী দিবস হিসেবে, যেদিন ছাত্ররা পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে জন সচেতনতা

.>>৮

উষ্ণায়ন, বিজ্ঞানী এবং আগাম সতর্কবার্তা

সৌমিত্র চৌধুরী: তাঁর নজরে এসেছিল নতুন কিছু। বহু দিনের পর্যবেক্ষণ। পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, তারপর সিদ্ধান্ত। পরীক্ষায় ধরা পড়া বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যুবক। তারপর থিসিস লিখলেন। বয়স তখন চব্বিশ। মনের মধ্যে অনেক স্বপ্ন। থিসিস জমা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী পাবেন। তারপর অধ্যাপনা, অনেক বড় জায়গায় গবেষণা করবেন।

কিন্তু শুরুতেই বিপদ। তার থিসিস বাতিল হয়ে যাবে। তেমনই মত বিশেষজ্ঞদের। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন যুবক। তবে অল্পতেই ভেঙে পড়া, দুর্বল চিত্তের যুবক ছিলেন না তিনি। ছিলেন বুদ্ধিমান, কর্মঠ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। আদতে চাষি পরিবারের সন্তান। বাবা-কাকা শিক্ষিত। পরিবারের ছেলেকে উচ্চ শিক্ষা দিয়েছেন। পড়িয়েছেন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সুইডেন দেশটির নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাসালা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা শিখেছেন যুবক। তারপর উচ্চ শিক্ষার জন্য গেলেন দেশের রাজধানী স্টকহোম শহরে। সেখানকার রয়াল সুইডিশ অকাদেমিতে (Ro–al Swedish Academy) উচ্চতর শিক্ষা, তারপর গবেষণা।

Source.www.google.com
স্যাভান্তে অগাস্ট আরেনিয়াস (১৮৫৯-১৯২৭)

উপাসালাও নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু সেখানে গবেষণা না করে কেন এলেন রাজধানী শহরের রয়াল সুইডিশ আকা-দেমিতে। উপাসালায় নাকি স্বাধীন ভাবে কাজের সুযোগ পাচ্ছিলেন অধ্যাপক-দের অনমনীয় মনোভাব সেখানে। নতুন কাজে তাঁরা নাকি উৎসাহ দিতেন না। তেমনই বলেছিলেন যুবক পরবর্তীকালে। উপাসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গাইড ছিলেন রবার্ট থ্যালেন। তিনি চাইতেন বিভিন্ন যৌগের বর্ণালী বিশ্লেষণ (spectral analysis)। বিষয়টি পছন্দের ছিল না যুবকের। তিনি চাইছেন অন্য বিষয়ে গবেষণা করতে।

যার সম্পর্কে আলোচনা তিনি পরবর্তীকালের নোবেল বিজয়ী (১৯০৩) বিজ্ঞানী। নাম স্যাভান্তে অগাস্ট আরেনিয়াস (Svante August Arrhenius)। জন্ম উপাসালা শহরের কাছে। একশ তেষট্টি বছর আগে (১৮৫৯, ফেব্রুয়ারি ১৯)। বাবা সাভান্তে গুস্তাভ আরেনিয়াস। জমির সার্ভেয়র। মায়ের নাম ক্যারোলিনা থুনবার্গ আরেনিয়াস।

স্যাভান্তে অগাস্ট আরেনিয়াস চব্বিশ বছরের যুবক। রয়াল সুইডিশ অকাদেমিতে গবেষণা করেছেন অধ্যাপক এরিক এডুল্যান্ড (উৎরশ ঊফষঁহফ)-এর অধীনে। তারপর ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য থিসিস জমা দিয়েছেন (১৮৮৩)। নতুন কথা লিখেছেন। থিসিসে নতুন পর্যবেক্ষণ বা তত্ত্ব থাকতেই হবে। স্যাভান্তে আরেনিয়াস তাঁর পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ লব্ধ জ্ঞান সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন থিসিসে।

কী বিষয় থিসিসের? লঘু দ্রবণ বিদ্যুৎ পরিবাহিতা (electrical conductivity of dilute solutions)। লিখছেন, অ্যাসিড, বেস ও সল্টে জলীয় দ্রবণ ভেঙে যায়। ভেঙে গিয়ে তৈরি করে ধ্বণাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়ন।

তখনকার ধারনা অনুযায়ী এই তত্ত্ব একদমই ভুল। তখন প্রচলিত ছিল মাইকেল ফ্যারাডে এবং অন্য বিজ্ঞানীদের অভিমত। সেই মত অনুযায়ী, দ্রবণে বিদ্যুৎ প্রবাহ চললেই তৈরি হয় আয়ন।

কিন্তু আরেনিয়াস বলছেন অন্য কথা! অ্যাসিডের মধ্যে থাকে হাইড্রোজেন আয়ন। জলে দ্রবীভূত হয়ে সেই অ্যাসিড মুক্ত করে দেয় হাইড্রোজেন আয়ন (H+)। আর ক্ষারীয় দ্রবণে থাকে হাইড্রক্সিল আয়ন (hydroxide ions, OH-)।

প্রচলিত ধারনার বাইরে এই তত্ব নিয়ে হাসাহাসি চলল। থিসিস পরীক্ষকরা মানতে রাজী নন। পরিণতি মারাত্মক। বাতিল হয়ে যাবে থিসিস এবং যুবক আরেনিয়াসের যাবতীয় স্বপ্ন।

এমনটা যে ঘটতে পারে, ভেবেছিলেন আরেনিয়াস। চব্বিশের উচ্চাকাঙ্খী যুবক তাঁর থিসিসের কপি পাঠিয়েছিলেন অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের। জার্মান বিজ্ঞানী অসওয়াল্ড (Wilhelm Ostwald), নেদারল্যান্ডের ভ্যান্ট হফ (Jacobus Henricus vanÕt Hoff) বিষয়টি পড়ে অভিভূত। ভ্যান্ট হফ তো তাঁর গবেষণাগারে কাজের সুযোগ দিয়ে ডাকলেন আর-হেনিয়াসকে। কিন্তু সেই সময় বাবা অসুস্থ, তাই যেতে পারেননি আরেনিয়াস।

ডক্টরেট ডিগ্রী পেলেন সুইডিশ অকাদেমি থেকে। তবে থিসিসের মান 'অতি নিম্ন'। তাই অধ্যাপকের চাকরি পেলেন না। তবে সুই-ডিশ অকাদেমি তাঁকে অবশ্য কাজের সুযোগ করে দিয়েছিল। অসওয়াল্ড এবং ভ্যান্ট-হফের সঙ্গে গবেষণা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। 'অ্যাসিড-বেস থিওরি' নিয়ে বহু গবেষণা করেছিলেন। 'ফিসিক্যাল কেমিস্ট্রি' এই বিভাগটির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অসওয়াল্ড, ভ্যান্ট হফের সাথে স্মরণ করা হয় বিজ্ঞানী আরেনিয়াসের নাম।

আশ্চর্যের কথা, যে থিসিস অনেক অধ্যাপকের বিচারে ছিল 'নিম্ন মানের' এবং 'বাতিল যোগ্য', পরবর্তী কালে সেই ১৫০ পাতার থিসিস তাঁকে এনে দিল অভাবিত সম্মান। বিজ্ঞানের বিশ্বশ্রেষ্ঠ পুরষ্কার,নোবেল প্রাইজ।

শুধু অ্যাসিড-বেস থিওরি নয়। বহু বিষয়ে গবেষণা করেছেন ভৌত রসায়ন বিজ্ঞানের (Physical chemistr) জনক, স্যাভান্তে অগাস্ট আরেনিয়াস। আবহাওয়া বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, প্রাণরসায়নে (Biochemistry) তাঁর অবদান আজকের দিনেও স্মরণ করতে হয়।

যেমন আবহাওয়া বিজ্ঞানে তাঁর অবদান। বর্তমান পৃথিবীর সবচাইতে বড় সমস্যা বিশ্ব উষ্ণায়ন। একশ বছর আগে বুঝতে পেরেছিলেন। হাতে বহু প্রমাণ নিয়ে আমাদের সতর্ক করেছিলেন সুইডেনের বিজ্ঞানী আরেনিয়াস। বলেছিলেন, ১৮৯৬ সালে কার্বন ডাইঅক্সাইডের যা পরিমাণ, ভবিষ্যতে সেটা বেড়ে দ্বিগুণ হলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়বে ৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ভয়ঙ্কর কথা! তাপমাত্রা ২ ডিগ্রী সেলসিয়াস বাড়লেই তো মহাপ্রলয়! সলিল সমাধি ঘটবে অনেক দেশের। আধুনিক গবেষণা মেনে নিয়েছে এই তথ্য। জানতে পেরেছি আরও বহু বিপদের কথা। ফলে মারণ ডঙ্কায় কেঁপে উঠছে ধরিত্রী।

আমরা কর্ণপাত করিনি বিজ্ঞানীর কথায়। করলে ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণ পেত পৃথিবী গ্রহ।

ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান ও
এমেরিটাস মেডিক্যাল স্যায়েন্টিস্ট,
চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা সংস্থা
soumitrag10@gmail.com

ভিনগ্রহীর চোখে বসুন্ধরা

সীমা মুখোপাধ্যায়: ভিনগ্রহীর চোখে বসুন্ধরা
চরিত্র:- ১. ভিনগ্রহী,
২. ভিনগ্রহী-২ ,
৩. মিমি (স্কুলপড়ুয়া)
৪. মিমির মা

দুই ভিনগ্রহের প্রাণী ভিন্যাক ও ভিন্দু টেলিস্কোপের চেয়েও শক্তিশালী যন্ত্র টেলি-স্ক্রিনোস্কোপের মাধ্যমে দেখছে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে।

ভিনগ্রহী: আরে দেখো দেখো ভিন্দু। এই গ্রহটাকে দেখো।

ভিনগ্রহী-২ : আরো ক্লোজে নিয়ে এসো ভিন্যাক। আরো আরো।

ভিনগ্রহী: আরে এটাতো পৃথিবী। ওমা পৃথিবী এমন ঝিমাচ্ছে কেন?

ভিনগ্রহী-২:- দাঁড়াও ভিন্যাক ব্যাপারটা বুঝতে হলে আরো ক্লোজ আপ ভিউ নিতে হবে।

ভিনগ্রহী: কি কান্ড দেখেছো ভিন্দু পৃথিবীর গায়ের ঘনসবুজ গাছপালার চাদর কেমন ভ্যানিশ হয়ে কংক্রিটের জঙ্গলে ভরে যাচ্ছে।

ভিনগ্রহী-২: ঠিকই তো। এদিকে দেখো হিমবাহগুলো কেমন গলতে শুরু করেছে।

ভিনগ্রহী: এই দেখো ওই দিকটাতে দাবানলে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে বন জঙ্গল আর পশুপাখিরা। আর এই দিকে সমুদ্রের পাড়ে দাপুটে ঝড়-ঝঞ্ঝায় সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ভিনগ্রহী-২: আরে শুধু শুধু কি আর বলে-ছিলাম পৃথিবী ঝিমুচ্ছে?

ভিনগ্রহী: ঠিকই বলেছ বসুন্ধরা মানে পৃথিবীকে রোগে ধরেছে। আচ্ছা মানুষ পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বুদ্ধিমান প্রাণী ওরা বুঝতে পারছেনা পৃথিবীর অন্তিম দশা শুরু হয়ে গিয়েছে?

ভিনগ্রহী-২: কেন বুঝতে পারবে না? আসলে রাষ্ট্রনেতারা ও তাদের পারিষদেরা লোভের খপ্পরে পড়েছে। তাই না বোঝার ভান করে নানান বাহানায় ভয়াবহ পরিস্থিতিটাকে মানতে চাইছে না।

ভিনগ্রহী : ঠিকই বেশিরভাগ বিজ্ঞানীরা তো কবে থেকেই সতর্কবাণী দিয়ে চলেছে। কে শোনে কার কথা?

ভিনগ্রহী-২ : আরে আরে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখো। আমি টেলিস্ক্রিনোস্কোপে "সম্মেলন" এর বোতামটা টিপে দিয়েছিলাম। অজস্র দিবস পালন আর নানান পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলন একের পর এক স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আরে দেখো দেখো একটা স্কুল পড়ুয়া মেয়ে একটা সম্মেলনে বড় বড় গণ্যমান্য মানুষদের কেমন ধমকে ধমকে বক্তব্য রাখছে।

ভিনগ্রহী: কি নাম বলতো মেয়েটার?

ভিনগ্রহী-২: দাঁড়াও দেখছি ভিন্যাক ওর নাম হল গ্রেটা থুনবার্গ। সুইডিশ মেয়ে। সুইডিশ পার্লামেন্টের সামনে প্রতি শুক্রবার "school strike for climate"এই প্ল্যাকার্ড হাতে বসে থাকতো। পরে সারা বিশ্বে স্কুলপড়ুয়াদের মধ্যে মুভমেন্টটি "Friday for future" নামে ছড়িয়ে পড়ে।

ভিনগ্রহী: বাহ্ এটা একটা ভালো খবর। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যদি এভাবে জেগে ওঠে তাহলে পৃথিবী টিকে গেলেও যেতে পারে।

ভিনগ্রহী-২: দাঁড়াও আরো ক্লোজ এ যাই। ঘরে ঘরে ছেলে মেয়েরা কি করছে দেখি। দেখো দেখো বাড়ির সকলে ঘুমোচ্ছে আর বাচ্চা মেয়েটা বসে বসে কি যেন লিখছে আর ঘরের চারপাশে পোস্টার ছড়ানো। একটাতে লেখা "পৃথিবীকে বাঁচাও" অন্যটাতে "বসুন্ধরা দিবস পালন করুন" আরেকটাতে লেখা "আমাদের একটাই পৃথিবী"।

ভিনগ্রহী: আমাদের এই টেলিস্ক্রিনোস্কোপ যন্ত্রটা বেশ জব্বর। আরো ক্লোজ এ যাও তো মেয়েটা কি লিখছে দেখি।।

ভিনগ্রহী-২: মনে হয় কবিতা লিখছে।

দাঁড়াও পড়ে শোনাই তোমাকে। কবিতাটা নাম "হতাশ পৃথিবী"।

পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে,
মেরু দেশের বরফ গলছে
সমুদ্রতল নীরবে বাড়ছে

ঝড়ঝাপটা ঘনঘন আসছে
খরা বন্যা প্রায়ই দাপাচ্ছে
বনে বনে দাবানল ছড়াচ্ছে

অপকারী পোকাতে ছেয়ে যাচ্ছে
ক্ষতিকর জীবাণুরা নৃত্য করছে
রোগবালাই দিনে দিনে বাড়ছে

বিজ্ঞানীর দল আগাম সতর্ক করছে
শীর্ষনেতাদের সম্মেলন হয়েই চলেছে
জনগণের দল বোঝার চেষ্টা করছে।

ছোটরা দিনদিন হতাশ হচ্ছে।
গ্রেটা থুন-বার্গের দল কৈফিয়ৎ চাইছে
পৃথিবী নীরবে করুণ হাসি হাসছে।

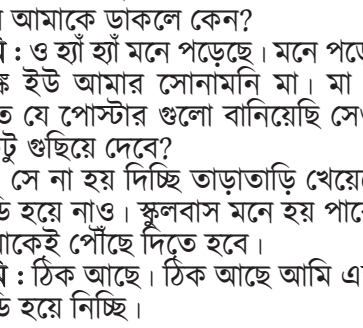
Source.www.google.com

ভিনগ্রহী : বাহ্ ঘরে ঘরে যদি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সজাগ হয়ে ওঠে। পৃথিবী কে বাঁচাতে নিজেদের সাধ্যানুযায়ী এগিয়ে আসে তাহলে পৃথিবীর ঝিমিয়ে পড়া ভাব বোধ হয় কেটে যেত....

মা: ওঠো ওঠো মিমি সোনা ঘুম থেকে ওঠো কটা বেজেছে জানো? ওমা ঘুমের মধ্যে গুন গুন করে গান করা হচ্ছে। কি কান্ড দেখো মেয়ের!

মিমি: ওঃ মা তুমি না যা তা কি দুর্দান্ত স্বপ্ন দেখছিলাম। তুমি আমাকে ঠেলে উঠিয়ে দিলে। উফফ্ তোমাকে কে ডাকতে বলেছে? সব বরবাদ করে দিলে।

মা: বাহ্ ক'দিন ধরে লাফাচ্ছিস স্কুলে বসুন্ধরা দিবস পালন হবে। দিন নেই রাত নেই আয়নার সামনে প্র্যাক্টিস হচ্ছে আন্টিদের সামনে বলতে হবে বলে। আর এখন বলছিস তুমি আমাকে ডাকলে কেন?

মিমি : ও হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। মনে পড়েছে। থ্যাঙ্ক ইউ আমার সোনামনি মা। মা প্লিজ রাতে যে পোস্টার গুলো বানিয়েছি সেগুলো একটু গুছিয়ে দেবে?

মা : সে না হয় দিচ্ছি তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে রেডি হয়ে নাও। স্কুলবাস মনে হয় পাবেনা। আমাকেই পৌঁছে দিতে হবে।

মিমি : ঠিক আছে। ঠিক আছে আমি এক্ষুনি রেডি হয়ে নিচ্ছি।

We shall overcome
we shall overcome

আঃ জস্পেশ স্বপ্ন দেখছিলাম। আমার পুরো মনে আছে। আজ স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে মোবাইল ঘাটা, ছাদে খেলতে যাওয়া সব বন্ধ। এসেই লিখে ফেলব। তারপর সবাইকে বলব।

We shall overcome
we shall overcome

সীমা মুখোপাধ্যায়
প্রাক্তন প্রোগ্রাম কোয়ার্ডিনেটর
এস আর সি পশ্চিমবঙ্গ
sima.ekdalia@gmail.com

পান্ডো: একটি বিস্ময় বৃক্ষ

তুহিন সাজ্জাদ সেখ: পান্ডো - একটি জীবন্ত বিস্ময় বৃক্ষ! পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম পপলার-বৃক্ষের প্রজাতি। আসলে এটি একটিই গাছ - একটি বীজ থেকেই জন্ম; তারপরে অজস্র গুঁড়ি তৈরি হয়ে বহু সংখ্যক শাখা-বৃক্ষের জন্ম হয়েছে।মনে হয় যেন একটি জঙ্গল!

মধ্য উটা'র অন্তর্ভুক্ত ফিশলেক জাতীয় অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত এই বিস্ময় বৃক্ষের জন্ম প্রায় বরফ যুগের শেষের দিকে।এই গাছটি ৪০ হাজারেরও বেশি শাখা-বৃক্ষের সাথে প্রায় ১০৬ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। বিষয়টি ১৯৭০ সালে সকলের নজরে আসে;সত্যিই এটি একটি বিস্ময়কর বৃক্ষ!

Source.www.google.com

বারুদে বিপন্ন ইউক্রেন

সুরাজ পাল: যুদ্ধ মানে অনিবার্য ধ্বংস, রক্তক্ষয়, অসংখ্য প্রাণহানি, দুঃখ দুর্দশা। যুদ্ধ কেবল মৃত্যু ও আর্থিক ক্ষতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, ডেকে আনে পরিবেশের বিপর্যয়। দুটি বিশ্বযুদ্ধসহ ভিয়েতনাম আফগানিস্তানযুগোশ্লাভিয়া উপসাগরীয়ইরাক দেখার পরেও, আজও রাষ্ট্রনেতারা যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। সাম্প্রতিক গ্লাসগো সম্মেলনের পর ভাবা হয়েছিল, শেষ চেষ্টা হিসেবে

Source.www.google.com

রাষ্ট্রনেতারা নিশ্চয় বিশ্ব উষ্ণায়ণ কমাতে অনেক বেশি উদ্যোগী উদ্যমী হবেন। কিন্তু রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সে আশা বিশবাঁও জলে।

কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ইউক্রেনে এখন যুদ্ধ চলছে। ইউরোপের মোট আয়তনের ছয় শতাংশ হলেও, মোট জীববৈচিত্র্যের প্রায় ৩৫ শতাংশ দেখা যায় এই দেশে। প্রায় ১৬ শতাংশ স্থলভাগ সবুজে ঢাকা। অনেকটা জুড়ে আছে জলাভূমি। সত্তর হাজারেরও বেশি বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমাগম এখানে। ট্যাঙ্ক, রকেট লঞ্চার, মিসাইলের দাপটে এই বনভূমি জলাভূমি বিপদের মুখে। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করেছেন, রাশিয়ার আক্রমণ তীব্র হলে অনেক বিরল প্রজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এমনকি তারা বিলুপ্ত পর্যন্ত হতে পারে।

চারটি বৃহৎ নদী নিপার, নিয়েস্টার, পিভডেনি বাগ এবং দানিয়ুব দেশের খাদ্য সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রমাগত বোমাবর্ষণ, গোলা-গুলি, ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ একদিকে যেমন নদীভূগর্ভ জলকে দূষিত করছে, অন্যদিকে চাষযোগ্য জমির পরিমাণও কমছে। যুদ্ধের কারণেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দুদেশের খাদ্য উৎপাদন। খাদ্যশস্য রপ্তানিকারক, রুটির ঝুড়ি খ্যাত ইউক্রেন ক্রমশ পরিণত হচ্ছে রুটিহীন দেশে। জাতিসংঘের খাদ্য কর্মসূচির প্রধান ডেভিড বিসলে বলেছেন, এভাবে চলতে থাকলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে খারাপ খাদ্যসংকটে ভুগবে সারা বিশ্ব।

ইউক্রেনের আকাশ ভরে গিয়েছে কালো ধোঁয়ায়। যুদ্ধে যে পরিমাণ বারুদের ব্যবহার হচ্ছে তা কার্বন নিঃসরণের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। সবথেকে বড় আশঙ্কা চেরনোবিলকে ঘিরে। যার দখল নিয়েছে রুশ সেনা। এছাড়া ইউক্রেনে আছে ১৫টি পরমাণু চুল্লি ও কয়েকটি রাসায়নিক প্ল্যান্ট। যার একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মুখে পড়বে গোটা ইউরোপ, এমনকি রাশিয়া নিজেও।

ইতিমধ্যেই ইউক্রেনের প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ নিজ ভিটেমাটি ছেড়ে পোল্যান্ড, মলদোভা, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, স্লোভাকিয়ায় আশ্রয় নিয়েছে। ছোট ভূখণ্ডে এত লোক একত্রিত হওয়ায় সেই দেশের পরিবেশ এবং শরণার্থীদের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পড়ছে। বলা হয়, যে কোনো যুদ্ধই মানবতা-বিরোধী, একই সঙ্গে তা পরিবেশ বিরোধী। সুতরাং, পরিবেশ ভালো রাখতে যুদ্ধ বা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিষিদ্ধ হওয়া খুব প্রয়োজন।

প্রোজেক্ট ফেলো
ইতিহাস বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
surajpal5858@gmail.com

Green Building
পরিবেশ ভালো রাখবে

সূর্যানী চ্যাটার্জি: মানব সমাজ ক্রমাগত নগরায়নের পথে হাঁটছে। বিগত কিছু বছরে পৃথিবীর প্রায় ৭০০ কোটি মানুষ গ্রামীণ সভ্যতা ছেড়ে শহুরে নাগরিক হয়ে উঠেছে এবং বর্তমানে ৫১% পৃথিবীর জনসংখ্যাই শহুরে। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নগরের ভূমি সম্পদের উপর এক বিশাল চাপ সৃষ্টি করেছে, যার মোকাবিলা করার জন্য উঁচু উঁচু অট্টালিকা তৈরী শুরু হয়েছে। কিন্তু এর ফলে যে পরিবেশ এবং তার সম্পর্কিত অবকাঠামোর উপর চাপ পড়তে থাকে তা বহুকাল যাবৎ অলক্ষিত থেকেছে।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এখনকার মানুষ প্রায় ৮৭% সময়ই ঘরের মধ্যে কাটায় - যেটিকে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে তাপ-উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত, পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল এবং উজ্জ্বল, আলোকিত করে রাখতে হয়। এর ফলে ২০০৯ সাল থেকে এখনো অবধি অন্তত ৪% মোট শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি বিশ্বের যেকোনো দেশ যেমন ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অতিরিক্ত শক্তির ব্যবহার যেমন পরিবেশের উপর চাপ সৃষ্টি করে তেমনি করে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উপর।

অন্যদিকে বিগত শতবর্ষে বিশ্ব উষ্ণায়ন উল্লেখ যোগ্য ভাবে বেড়ে চলেছে যার প্রভাব পানীয় জলের উপর পড়ছে। তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে 'green building' এর প্রসঙ্গ ওঠা একদমই অপ্রাসঙ্গিক নয়। এই 'green' কথাটির ব্যবহার এখানে হয়েছে দক্ষ শক্তি বা বলা ভালো কম শক্তি ব্যবহার করে কিভাবে পর্যাপ্ত বাসস্থানের তৈরী করা যায়, যা কিনা স্বাস্থ্যকর, আরামপ্রদ হবে এবং উৎপাদনশীলতায় অনেক বেশি সক্ষম হবে। এটি উভয় micro এবং macro দুই পরিপ্রেক্ষিতেই ভালো। এই প্রকল্পে প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন জলের সঠিক নিয়ণ্ত্রিত ব্যবহারের উপরও কৌশলগত ব্যবস্থাপনা করা হয়। অথঃপর বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং প্রযুক্তির সাহায্যে গবেষকরা, যারা মানব factor engineeringএর সাথে যুক্ত, তাদের মত অনুযায়ী, যদি বেশি করে এই ধরণের মৎববহ building বানানো যায় তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দূষণ, বিশ্ব উষ্ণায়ন এই ধরণের সব সমস্যারই সমাধানের একটা পথ খুলে যাবে।

এই বিষয়ে United States Green Building Council, LEED (Leadership in Energy Environmental Design) গঠন করে যারা green building এর জন্য certifz করে থাকে। বর্তমানে বেশ কিছু দেশে (যার মধ্যে ভারতও অন্যতম) অনেক প্রকল্প এই LEED Gi certification অনুযায়ী green building তৈরী করেছে। কিন্তু তার যথাযথ জনপ্রিয়করণ এখনও প্রয়োজন।

বাণিজ্যিক এবং বাসযোগ্য উভয় অট্টালিকার ক্ষেত্রেই এই ধরণের building করা যায়, যেখানে, vegetated rooftop বাগান, low maintenance naive grass, বৃষ্টির জল ধরার ব্যবস্থা, সঠিক বাইরের রং এবং shading, exterior light shelves, controlled natural lighting সঙ্গে সঠিক interior এর রং, operable window, carbon dioxide সেন্সর এর সাহায্যে indoor air quality রাখা প্রভৃতি ব্যবস্থা থাকবে। এর ফলে হয়তো কিছুটা পরিবেশগত ধারণক্ষমতা/স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হবে।

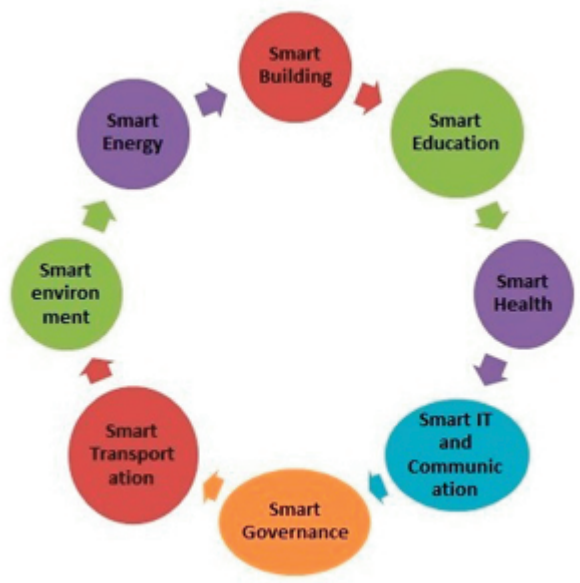

সূর্যানী চ্যাটার্জি
অধ্যাপিকা,
শারীরবিদ্যা বিভাগ,
বসিরহাট কলেজ
surjanic@gmail.com

হারিয়ে যাচ্ছে গাঙ্গেয় ডলফিন

মহ. আসিফ: গঙ্গা নদীর ডলফিন বা গাঙ্গেয় ডলফিন(শুশুক) ভারতের জাতীয় জলজ প্রাণী। আর এই ডলফিনের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। অথচ গাঙ্গেয় ডলফিন নদীকে নির্মল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জলাশয়ের বাস্তুতন্ত্র অর্থাৎ উপড় system কে সংরক্ষণ করলে তবেই সুরক্ষিত থাকবে আমাদের নদনদী এসব মানুষের জীবনধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গাঙ্গেয় শুশুক বা গ্যাঙ্গেটিক ডলফিন নদীর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। সর্বোচ্চ পর্যায়ের খাদক হওয়াতে নদীর জলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা খাদ্য শৃঙ্খল রক্ষায় এদের ভূমিকা অতুলনীয়। প্রায় সব ধরনের মাছ ডলফিনের খাদ্য হওয়াতে নদীতে ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন এবং জু প্ল্যাঙ্কটনের ভারসাম্য ঠিক থাকে। আচমকা যে কোনও এক শ্রেণির প্ল্যাঙ্কটনের সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেলে জল দূষণের সম্ভাবনা বাড়ে। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের অনুপাত কমে গিয়ে জলজ পরিবেশের ক্ষতি হয়। ডলফিন নদীর নিম্ন অববাহিকার বিস্তীর্ণ অংশে ঘুরে ঘুরে মাছ খাওয়ার ফলে ওই অংশে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য এবং জলের গুণগত মান বজায় থাকে। গাঙ্গেয় শুশুক বা ডলফিন বিপন্ন প্রাণী। নদীকে বাঁচিয়ে রাখতে তাই এর উপস্থিতি বজায় রাখা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন বা উদ্ভিদ প্ল্যাঙ্কটন এবং জু প্ল্যাঙ্কটন বা প্রাণিজ প্ল্যাঙ্কটন মূলত বিভিন্ন শ্রেণীর মাছের খাদ্য। কিছু মাছ উদ্ভিদ প্ল্যাঙ্কটন কে আহার হিসেবে গ্রহণ করে। কিছু মাছ জু প্ল্যাঙ্কটন কে আহার হিসেবে গ্রহণ করে। রাক্ষুসে মাছ ছোট ছোট মাছকে আহার হিসেবে গ্রহণ করে।

জলের খাদ্যশৃঙ্খল বজায় রাখতে ডলফিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অজয় নদের ও গঙ্গার অবস্থা কেমন ? বিশেষজ্ঞরা, ডলফিনের সংখ্যা দেখেই অনুমান করে থাকেন। নদীর যে অংশে ডলফিন বেশি, সেখানে মাছও বেশি । ডলফিন থাকলে সুস্থ মাছের বংশবৃদ্ধি খুব ভালো হয়ে থাকে। সচরাচরই দেখা গেছে মোহনার দিকেই ডলফিনের বেশি দেখা মেলে।

সম্প্রতি, পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার অজয় - গঙ্গা মোহনা শাঁখাই ঘাটে পূর্ব বর্ধমান জেলার বন দপ্তরের উদ্যোগে ডলফিন সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসন, পৌরসভা, মৎস্য

দপ্তর, বন দপ্তর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা সহ ৭০ জন মৎস্যজীবীরা অংশ নেন আলোচনা সভায়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরেন বন্য প্রাণী কর্মী ও গঙ্গা প্রহরী উপাধি পাওয়া গণেশ চৌধুরী। তিনি বলেন, বিগত পাঁচ মাসে ১১ টি গাঙ্গেয় ডলফিনের মৃত্যু হয়েছে পর্যাপ্ত খাবারের অভাব ও জেলেদের মাছ ধরার জালে আটকে পড়ার ফলে। ২০০৪ সালে ২৫০টি ডলফিন ছিল কাটোয়ার কল্যানপুর থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত মাত্র ৫৬ কিলোমিটার ব্যাবধানের মধ্যে। বর্তমানে মাত্র ৪৬টি ডলফিনের দেখা মিলেছে।

কল্যাণ দাস, অতিরিক্ত প্রধান মুখ্য বনপাল দক্ষিণ পূর্ব চক্র তিনি বলেন, জৈবিক জলদূষণ রোধ করতে এই জলজ প্রাণীর অবদান অপরিসীম। এরাই নদী দূষনের স্বয়ংক্রিয় পরিশোধন করে থাকে। কিন্তু নানান কারণে তারাই আজ বিপন্ন। এদের বিপন্নতা বা Reduction in the individual species বাস্তুতন্ত্রের ঘোর বিপদ ডেকে আনতে পারে। মুর্শিদাবাদ থেকে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে নদী তীরবর্তী এলাকাতে কলকারখানা, কাপড়ের কল, ট্যানারি, রাসায়নিক বা পেপার মিল, জুট মিল ইত্যাদি আছে প্রায় ২৬৫টি। Chemical Factory থেকে বর্জ্য তরল যায় ৩৬১টি Chemical এর সাহায্যে। তীরবর্তী অঞ্চলের বর্জ্য পদার্থ ৭৩ শতাংশ জল দূষনের কারণ।

এই সব নদ নদীকে নির্মল রাখতে প্রথমেই প্রয়োজন এদের জীববৈচিত্র্য সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখা। জলাশয়ের বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম কে সংরক্ষণ করলে তবেই সুরক্ষিত থাকবে আমাদের নদনদী। নদনদী আমাদের জীবনধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই গঙ্গা নদীর প্রবাহ গোমুখ থেকে গঙ্গা সাগর ২৫৩৯ কিলোমিটার। ভারতের স্থল ভাগের ২৬ শতাংশ এর উপর নির্ভরশীল। গঙ্গা আমাদের জাতীয় নদী, পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গিপুর থেকে বঙ্গোপসাগর মোহনা পর্যন্ত ভাগিরথী ও হুগলি নামে পরিচিত এই নদীর Winding Distance প্রায় ৫২৪ কিলোমিটার। বাঁশলাই, ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, হলদি, জলঙ্গি ও চূর্নি এর প্রধান উপনদী। অজয় নদের দৈঘ্য প্রায় ২৯৯ কিলোমিটার।

মহ. আসিফ
সম্পাদক
জবরখবর
asifbdn@rediffmail.com

সহজ ভাষায় বিজ্ঞান

দেবপ্রসন্ন সিংহ: বিজ্ঞান সব স্তরে সহজবোধ্য নয়। আবিষ্কারে, পরীক্ষায়, প্রকাশে এমন কি ব্যবহারেও তার ভেদাভেদ আছে। তবু জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বহু দিককে আমরা নিজেরা বুঝে অন্যদেরও বোঝাতে চেষ্টা করি, সহজ করার নানা উদ্ভূত উপায়ে। তা কাগজে, ঠিকঠাক শব্দচয়ন করে, পাঠকের চেনা ভাষায়, আকর্ষণীয় করে লিখে; কখনো বা

Source.www.google.com

আরো ছবি দিয়ে, মডেল তৈরি করে, ব্যাখ্যা দিয়ে, প্রশ্নোত্তরের সুযোগ দিয়ে, প্রয়োজনে সামর্থে যন্ত্র সাজিয়ে, গভীর তত্বের খোলস খুলে।

এই একবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে এসে সহজ, ভাষা, ও বিজ্ঞান এই তিনটি শব্দেরই নানাবিধ নিত্য বিবর্তনে, বোধকরি নব নব সংজ্ঞায় ও প্রকারভেদে, আমাদের ফিরে ফিরে ভাবতে হবে কিভাবে আমরা ঠিক বার্তাটি পৌঁছে দিতে পারব, এবং তাদেরই কাছে, যারা সেটি যথেষ্ট ঠিকঠাক বুঝে, বিজ্ঞানকে সাথী করবে, বিজ্ঞানের পরবর্তী বার্তায় আস্থাবান হবে, অন্যদেরও শামিল করবে।

আমরা চারদিকে যে প্রকৃতিকে, উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানের এক বড় শাখাকে, এতদিন যা দেখে এসেছি, তার রূপবদল হয়েছে; সেই পুরনো বিজ্ঞান এবং নতুন বিজ্ঞানের বিষয় কিছুটা তো জানতে হবেই আমার চেনা, ধরে নিই বেশির ভাগটা মাতৃভাষায় (অনেকের ইংরেজিতে এবং অবশ্যই মাতৃভাষা মিশিয়ে)। সহজ করার রাস্তা অত মসৃণ না। পরিভাষা ঝাঁকে ঝাঁকে আজ ব্যবহার করলে বিজ্ঞান হারায় তার আধুনিকতার প্রাসঙ্গিকতা, বোধকরি কৌলীন্যও। সংবাদপত্রে, বিভিন্ন শ্রাব্য/দৃশ্য মাধ্যমে, নব সামাজিক মাধ্যমেও তার প্রভাব লক্ষণীয়। সময় এসেছে বিজ্ঞানের কথা সহজ ভাবে বলার জন্য, বাক্য নির্মাণের বদলে কখনো বা প্রতীক চিহ্ন, লেখার জন্য নতুন নতুন শব্দের প্রণয়ন, ব্যবহার ও অবশ্যই, রীতি অনুশাসন।

বিজ্ঞানের অনেক চিন্তাই আন্তর্জাতিক এবং বিশ্ব-ব্যাপী তার অবস্থান। সেই বিষয়কে ভিন্ন ভাষা থেকে আয়ত্ত করা যতটাই দুরূহ নিজ চেনা ভাষায়, সহজ ইংরেজিতে বা সহজ বাংলায় লেখা বা ভেঙ্গে ভেঙ্গে বলা ততটাই কঠিন। কিন্তু সময়ে সময়ে বিভিন্ন উপাদানে, বক্তব্যে এর সমাধান এসেছে, আরো এক উত্তরণে। এ আর এক ধরনের অনুবাদ বা রূপান্তর। একই ভাষার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদ, শহরে গ্রামে আলাদা, সবই সহজ করার নিরিখে বা উদ্দেশ্যে। অনেক ক্ষেত্রে ভাষা ও বিবিধ ভঙ্গীতে, আকারে ইঙ্গিতে তুলনায়, তা বোঝাতে হয় বা কমিউনিকেট করতে হয়।

রচনার প্রাঞ্জলতা ও বিভিন্ন গুণ বুদ্ধির প্রখরতা নিয়ে শেষ কথা ফিরে আবার বলতেই হয়। বিজ্ঞানসচেতন, যুক্তিনির্ভর হলে সমাজ ও পরিবেশের অনেক সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন স্তরে কথায় বোঝা সম্ভব আর তার থেকে লেখ্য ভাষায় এনে সহজ করে আর এক স্তরে বোঝানো যায়; মনে রাখতে হবে, জানার আগ্রহ জনসাধারনের, আর জানাবার আগ্রহ এবং, বোধকরি, দায়বদ্ধতাও বিজ্ঞানীদের এবং সায়েন্স কমিউনিকেটরের নিরন্তর নিরলস প্রচেষ্টায়।

ফেলো
কম্পিউটার সোসাইটি অব ইন্ডিয়া
devaprasannasinha@rediffmail.com
devaprasannasinha1211@gmail.com

সভ্য অসভ্য

নটরাজ মালাকার: করোনাকালে দেশের 'সভ্য' মানুষেরা যখন রাষ্ট্রের কাছে সবার জন্য বিনামূল্যে টিকার দাবি করছেন তখন এদেশের আদিম বাসিন্দাদের উত্তরসূরীরা ঠিক যেন স্রোতের বিপরীতে যাত্রা করেছেন। খবরে প্রকাশ, ওড়িশার রায়গড় জেলার কন্ধ সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা কোভিড-১৯-এর টিকা নেওয়ার ভয়ে তাদের বাড়ি-ঘরে তালাবন্ধ করে পালিয়ে গিয়েছেন। গুজবের বশবর্তী হয়ে তারা বিশ্বাস করেছেন যে, যারা টিকা নেবেন দু'বছর পরেই তাদের মৃত্যু হবে। উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়ের একটি উপজাতি গ্রামের বাসিন্দারা তাদের গ্রামে কোভিড টেস্টিং টিমের আগমনের খবর পেয়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছেন। কিন্তু এই গল্প তো আর নতুন নয়। ইতিহাসের পাতা উল্টে একবার একশো বছর পিছনে ফেরা যাক। বিংশ শতকের প্রথম দিকে আমারিকায় সবার জন্য বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য বিমা চালু করা নিয়ে তখন বিতর্ক চলছে। সেই বিতর্কে অংশ নিয়ে 'আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবার' (এএফএল)-এর প্রেসিডেন্ট বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য বিমাকে একটি অপ্রয়োজনীয় পিতৃতান্ত্রিক সংস্কার হিসাবে নিন্দা করেছিলেনষ তাঁর মতে, মানুষের স্বাস্থ্যের উপরে রাষ্ট্রের তদারকির ব্যবস্থা তৈরি করবে। এবার আসি ভারত প্রসঙ্গে। এদেশে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করতে ইংরেজ জাতি পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়েছিল, হাতিয়ার করেছিল 'মেডিসিন'কে। রোগ প্রতি-রোধে তারা 'আইসোলেশন', 'অবজারভেশন' এবং 'কন্ট্রোল' এই তিন নীতি গ্রহণ করেছিল। এই নীতির একটি অঙ্গ ছিল টিকাকরণ। ১৮৭৮ এর গ্রীষ্মে লাহোরে যখন স্মল-পক্স ছড়িয়ে পড়ছিল তখন গুজব রটে যে সরকার নাকি আদেশে দিয়েছে দেশীয় মহিলাদের স্তনে টিকা দেওয়া হবে! মানুষ যাতে বসন্ত রোগের টিকা নিতে বাধ্য হয় তার জন্য রাষ্ট্র প্রথম ১৮৮০ সালে আইন তৈরি করেছিল।

Source.www.google.com

কলকাতা প্লেগের সময়ও অন্তহীন গুজব ছড়ানো হল চারিদিকে। জনগণের ধারণা হয়েছিল -- সাদা বোম্বাই এম্বুলেন্সের মধ্যে রোগীদের নাকে কিছু ঢুকিয়ে দেওয়া হবে এবং তা কণ্ঠনালী দিয়ে শরীরে প্রবেশ করলে তারা মারা যাবে; ভাইসরয়ের আদেশে টিকাদারগণ মানুষকে মেরে ফেলার জন্য সুচ দিয়ে মানুষের শরীরে বিষ প্রয়োগ করছে। শেষ অবধি কলকাতার নিম্নবর্গের মানুষেরা সরকারের মেডিকেল পলিসির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বসলো। এমনকি টিকাদার সন্দেহে এক অস্ট্রিয়ানকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল উন্মত্ত জনতা। চাপে পরে সরকার প্লেগ প্রতিরোধ নীতিতে কিছুটা শিথিলতা এনেছিল। আসলে এদেশে রাষ্ট্র ও সমাজ চিরকাল দুটো পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিরাজ করেছে। তাই দেশীয় সমাজ রাষ্ট্রের কোনো নীতিকে সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। সমাজ মনে করে মানুষ নিজেই তার শরীর ও স্বাস্থ্যের নিয়ন্ত্রক। শরীরের ওপর রাষ্ট্রের খবরদারি তারা পছন্দ করে নি। যদিও শিক্ষিত সভ্য মানুষেরা রাষ্ট্রের তৈরি করা খাঁচায় ঢুকতে পছন্দ করেছে। কিন্তু আদিবাসীরা?

বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ভেরিয়ার এলউইনের বক্তব্য হচ্ছে সভ্যতার সংস্পর্শ আদবাসীদের পক্ষে অত্যন্ত অকল্যাণকর ব্যাপার। তাঁর গবেষণা বলছে ভারতে উন্নত সংস্কৃতির দূষণ যেসব আদিবাসীর জীবনকে স্পর্শ করেনি তারা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করেছেন। অন্যদিকে, সভ্য সমাজের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলে আদিবাসীরা দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে।

ইউ আর এস
ইতিহাস বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
natarajandulberia@gmail.com

কুসংস্কার দূরীকরণে বিজ্ঞানচর্চা

সেখ জিন্নাত আলি: মানুষের মন বড় দুর্বল। মনের পাল্লা যে কখন কোনদিকে ঝুঁকে যাবে তা বলা মুশকিল। আর মনের এই দুর্বলতার কারনেই অসাধু এবং অজ্ঞ মানুষেরাও শিক্ষিত, জ্ঞানী এবং পণ্ডিত মানুষদের বোকা বানিয়ে তাবিজ, কবজ, আর মাদুলি পরতে বাধ্য করেছে। ঝাড়ফুঁক আর ওঝার কেরামতি থেকে রক্ষা পায়নি বিদ্যাহীন মানুষ থেকে শুরু করে বহু উচ্চ শিক্ষিত মানুষ। যারা ওঝা বা ওস্তাদের কেরাম-তির জগৎকে তাচ্ছিল্য করে বেরিয়ে যেতে পেরেছে তারাও আটকা পড়েছে জ্যোতিশির পাথর আর আংটির কবলে।

তাবিজ, কবজ, মাদুলি, পাথর আর আংটি মানুষের উপকার করেনা। এমনকি উপকার করে কিনা তার সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ নেই। অথচ মনের দুর্বলতার কারণে বহু মানুষ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তা প্রমাণিত। এমনকি ওঝার কেরামতির কারনে বহু সাপে কাটা রোগীর প্রান গেছে, বহু হিস্টিরিয়া রোগীর সমস্যা আরো জটিল হয়েছে এর ভুরি ভুরি উদাহরণ আমরা সংবাদ পত্রে পড়ি।

মানুষের মনের দুর্বলতাকে সারিয়ে তুলে কুসংস্কার মুক্ত করতে হলে বিজ্ঞান চর্চার কোন বিকল্প নেই। সঠিক তথ্য এবং পরিসংখ্যানের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতাকে আরো বাড়াতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীর কথা। এর প্রতিরোধ এবং চিকিৎসায়, বিভিন্ন রোগের সঠিক চি-কিৎসা করতে, বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ও তার ব্যবহারে মানুষকে পারদর্শী করতে, নিত্যনতুন যানবাহন আবিষ্কার, তৈরি ও মেরামতির কাজে মানুষকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে, এমনকি মানুষের প্রয়োজনের প্রায় সমস্ত জিনিসে আবিষ্কার, তৈরি এবং মেরামতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের একচেটিয়া ভূমিকা রয়েছে।

আগামী দিনে মানুষ যাতে আবহাওয়া মণ্ডলের পরিবর্তনের কারনে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, ক্ষরা, বন্যা, ভূমিকম্প, দাবানলের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে সুরক্ষিত থাকে তার জন্য বিজ্ঞান গবেষণার যথেষ্ট শক্তিশালী ভুমিকা রয়েছে। আগাম সাবধান করা থেকে শুরু করে পরিত্রাণের উপায় পর্যন্ত পথ দেখায় বিজ্ঞানী, গবেষণা এবং বিজ্ঞান। এর জন্য বিশ্বজুড়ে রয়েছে বহু প্রতিষ্ঠান। কলকাতাতেই রয়েছে বসু বিজ্ঞান মন্দির, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের মত বহু বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং চর্চা কেন্দ্র। বহু মানুষের চিন্তা, চর্চা, গবেষণা, আবিষ্কার, লেখার কারনেই আমরা পেয়েছি আধুনিক পৃথিবী।

Source.www.google.com

একদিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, তার গবেষণা এবং ব্যপ্তি যা বহু পরিশ্রম আর ব্যয় সাপেক্ষ। অন্যদিকে সহজে কিছু পাওয়া বা সমাধানের আশায় ওঝা বা জ্যোতিশির খপ্পরে পড়া। দুটি বিষয় কি কখনো এক হতে পারে? কখনই নয়। তাই বিজ্ঞান চর্চার পরিধি আরো বাড়াতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে। বাড়াতে হবে চর্চা কেন্দ্র, আলোচনা সভা। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে তুলতে হবে বিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা কেন্দ্র, গড়ে তুলতে হবে হাতে কলমে বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের উপযুক্ত পরিসর। তা হলেই গড়ে তোলা সম্ভব হবে কুসংস্কার মুক্ত মন, সমাজ এবং পৃথিবী। এর জন্য সঠিক তথ্য, পরিসংখ্যান এবং বিজ্ঞান গবেষণা যেমন প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন আরো বেশি চর্চা এবং প্রচারের।

সঠিক ভাবে বিজ্ঞানের সাফল্যকে উপস্থাপিত করতে পারলেই মানুষ বুঝতে পারবে তাবিজ, কবজ আর মাদুলি বাঁধলেই সফল হওয়া যায়না। এর জন্য পরিশ্রম করতে হয়। আর আঙ্গুলে একটি পাথর বা আংটি পরলেই মহাকাশ যাওয়া যায়না। এর জন্য প্রকৃত গবেষণা প্রয়োজন।

সায়েন্স কমিউনিকেটর
sjasciencecommunicator@gmail.com

কিশলয়ের আঙিনায়

পৃথিবীর অতীত ও বর্তমান

অর্নিমা দাস
ষষ্ঠ শ্রেণী
সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, কলকাতা

Indian Science News

INDIAN SCIENCE NEWS ASSOCIATION

92, Acharya Prafulla Chandra Road, Kolkata - 700 009

☎: 033-2350-2224 ❖ e-mail: editorial.scienceandcuilture@gmail.com

মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণায় ছাত্র বৃত্তি / পুরস্কার

বর্তমানে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্রদের মধ্য থেকে ভৌতবিজ্ঞান ও জীবনবিজ্ঞান - এর যে কোন পছন্দের বিষয়ে একটি রচনা আহ্বান করা হচ্ছে। ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন কে দেওয়া প্রফেসর মৃণাল কান্তি দেওয়ানজী, ইউ.এস.এ., র বৃত্তির অনুদানের অর্থ থেকে নির্বাচিত রচনাকে পুরস্কৃত করা হবে ও সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে ছাত্রবৃত্তি/ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

ভৌতবিজ্ঞান ও জীবনবিজ্ঞান- এই দুটি বিষয়ের প্রতিটি বিষয়ে একটি করে রচনা নির্বাচন করা হবে। দুটি বিষয়ের প্রতিটির একটি করে নির্বাচিত রচনার সম্মাননা ১০,০০০/- টাকা ও শংসাপত্র।

পদ্ধতি

১) মৌলিক বিজ্ঞান গবেষনা ও ট্রান্সলেশনাল গবেষণার গুরুত্ব ও সমাজে এর প্রভাব সম্পর্কে যে কোন একটি বিষয়ে প্রস্তাবনার রচনা (অনধিক ২০০০ শব্দে) আহ্বান করা হচ্ছে।
রচনা জমা দেওয়ার ঠিকানা : প্রতি, দ্য অনারারি সেক্রেটারিস, ইন্ডিয়ান সাইন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন, ৯২, এ.পি.সি. রোড, কলকাতা - ৭০০০০৯

২) আবেদনকারী অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাসিন্দা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩) রাজ্য মাধ্যমিক সংসদ আয়োজিত দশম শ্রেণীর মূল পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিষয়ে আবেদনকারীর ন্যূনতম ৮৫% সার্বিক মূল্যমান থাকা জরুরী।

৪) আবেদনপত্র (প্রস্তাবনার রচনা) টি বর্তমান প্রতিষ্ঠানের মুখ্য অধিকর্তা মারফৎ প্রেরণ করতে হবে।

৫) আবেদনপত্র গ্রহণ করার সময়সীমা থ.০৪.২০২২ পর্যন্ত।

৬) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিযুক্ত বিশেষজ্ঞগণ প্রস্তাব/ প্রস্তাবনার রচনাগুলির মূল্যায়ন করবেন।

৭) নির্বাচিত আবেদনকারীগণকে বিশেষজ্ঞগণের সামনে লেখায় উল্লিখিত / বর্ণিত / বিবৃত প্রস্তাবটি / প্রস্তাবনাটি উপস্থাপন করতে হবে। নির্বাচন, উপস্থাপন, এবং এই সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিযুক্ত বিশেষজ্ঞগণের আলোচনা ও বিচারাধীন। এই বিষয়ে সকল তথ্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা যথাসময় জানানো হবে।

৮) সম্মান প্রাপকগণকে সম্মানজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে হবে ও নিজ প্রস্তাব বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।

জীবজগতে রংবেরং

গৌতম দত্ত:

বিষাক্ত বিহঙ্গ বিষাক্ত ব্যাঙ, কালকুট কীট, সর্বনাশা সাপ ইত্যাদির কথা বহু শুনেছি, কিন্তু বিষাক্ত বিহঙ্গ মানে পাখি? পরমা প্রকৃতিতে অসম্ভব বলে কি কিছুই নেই? কথা হচ্ছে, পৃথিবীর বিষাক্ত পাখিদের

অন্যতম hooded pitohui বা গুণ্ঠিত পিটোহুই পাখির ব্যাপারে। পিটোহুই পাখি নিউ গিনির বিভিন্ন দ্বীপে পাওয়া যায়। নিকটবর্তী ইন্দো-নেশিয়ান দ্বীপ ইয়াপেন-এও এদের দেখা মেলে।

সুকণ্ঠী গায়ক পাখি বিষাক্ত কেন? কারণ এদের খাদ্যাভ্যাস। ডুমুর জাতীয় ফল ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের গুবুরে পোকা, মাকড়সা, শুঁওপোকা ইত্যাদি খেয়ে থাকে, এবং এদের মধ্যে অনেক পতঙ্গই বিষাক্ত। সুতরাং নীলকণ্ঠের মত এই বিষ নিজের দেহে ধারণ করে। এদের পালকে উপস্থিত বিষ দেখে বোঝা যায় শুধু বিষ খায় না বিষ মাখে সর্বাঙ্গে।

কেমন বিষ? গবেষণায় পাওয়া গিয়েছে একটি নার্ভ বিষ বা নিউরোটক্সিনষ নাম যড় mobatrachotoxin হোমোব্যাটরাকো-টক্সিন। এছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের ব্যাটরাকোটক্সিন।

২২--২৩ সেন্টিমিটার লম্বা ৬৫--৭৫ গ্রাম ওজনের এই পাখির মাথা বুকের উপরের অংশ এবং লেজ কালো পালকে ঢাকা। বাকি অংশ উজ্জ্বল গাঢ় বাদামী বা কমলা বর্ণের। উজ্জ্বল রং এদের সাবধান বাণী; আমাকে ছুঁয়েছ কি মরেছ! বিষাক্ত এই বিহঙ্গের বিজ্ঞানসম্মত নাম Pitohuidichrous।

* * * * * * *

সুন্দরী শতপদী: তেতুঁলে বিছে নাম শুনতেই লাল বা কালচে লাল, হাড় হিম করা কদাকার আকৃতি মনে পড়ে। আদতে সেন্টিপেড কথাটি এসেছে লাতিন শব্দ centi মানে একশ এবং pedis মানে পা। কিন্তু যে সেন্টিপেড বা তেতুঁলে বিছের কথা হচ্ছে তা মোটেও ভয়ালদর্শন নয়। বরং, অসাধারণ

সুন্দর ধাতব গায়ের রং। এর নাম লম্বাপেয়ে তেতুঁলে বিছে, ইংরেজিতে Long-Legged Centipede। হ্যাঁ, তবে এদের ১০০ টি নয় বরং ১৫ জোড়া পা থাকে। বিজ্ঞান সম্মত নাম Thereuopoda longi-cornis।

এরা শিকারী সন্ধিপদী প্রাণী এবং প্রধানত গুহায় বসবাসে সচ্ছন্দ। এরা অন্যান্য পোকা মাকড় যেমন ঝিঁ ঝিঁ পোকা, উই পোকা, মাকড়সা, ফড়িং ইত্যাদি শিকার করে খায়। এরা ১০ সেন্টিমিটার অবধি লম্বা হতে পারে। সামনের প্রথম জোড়া পা শিকার ধরার জন্যে অভিযোজিত। এই সুন্দর কিন্তু ভয়ানক প্রাণীকে সিঙ্গাপুরে দেখা যায়।

* * * * * * *

ক্রিস্টমাস শাখী কীট: ২৫ সে ডিসেম্বর বড় আনন্দের বড় দিন, তাই বন থেকে পাম বা দেবদারু গাছ কেটে তাতে টুনি ঝুলিয়ে অপেক্ষা কখন বুড়ো সান্তা আসবে। অথবা প্লাস্টিকের ক্রিস্টমাস তরু সাজিয়ে রাতভর হুল্লোড়। গাছ কাটাই হোক বা প্লাস্টিকের ব্যাবহার উভয় ক্ষেত্রেই পরিবেশ দূষণ অবশ্যম্ভাবী।

পরমা প্রকৃতি এ ব্যাপারে সাবধানী, একটি গোটা জীবকে সাজিয়েছেন নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে যাতে একটি দিন নয়, দিনের পর দিন তা ক্রিসমাসের আনন্দ দিতে পারে.....

বিশ্বাস হল না তো? বলছি Christmas tree worm এর ব্যাপারে। পর্ব অ্যানিলিডা এবং শ্রেণী পলিচিটা polychaeta‡Z অবস্থান করা এই প্রাণীরা নানা বর্ণের এবং দেহাকৃতি প্যাঁচানো। এরা নলাকার গর্তে

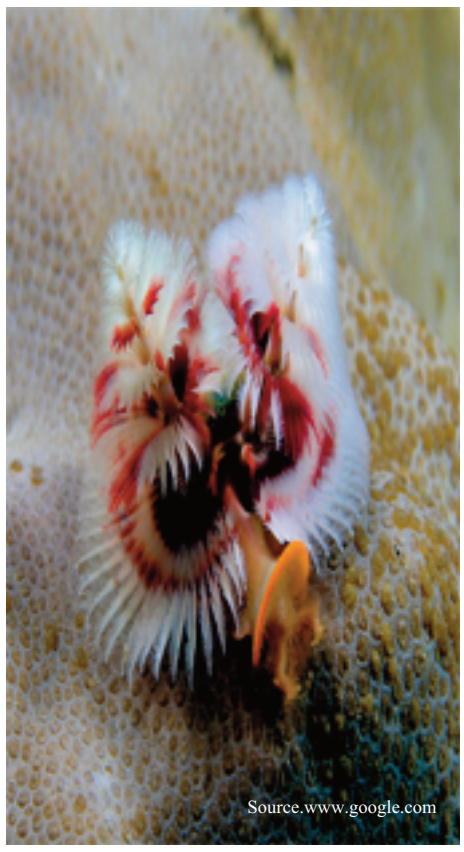

নিজেদের লুকিয়ে রাখে। কারণ এরা সাঁতার কাটে না, একজায়গায় থেকে নিজের সমস্ত পালকের ন্যায় radiol মেলে ধরে। না, ময়ূর যেমন পেখম মেলে সঙ্গীর আকর্ষণে, এরা সে জন্যে করে নাষ বরং এদের radiol (রেডিওল)গুলিতে প্রচুর চুলের মত পরষরধ সিলিয়া থাকে যা জলে ভাসমান শিকার আঁকড়ে ধরে।

ক্যারিবিয়ান থেকে ইন্দো প্রশান্ত মহ-াসাগরীয় প্রবাল প্রাচীর বা প্রবাল বনে এরা বসবাস করে। প্রবাল প্রাচীর যেভাবে নষ্ট হচ্ছে তাতে প্রকৃতির এই বিস্ময়কর প্রাণী কিভাবে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে তা সত্যি একটি প্রশ্ন।

রংবেরংয়ের প্যাঁচানো ক্রিস্টমাস শাখী কীটের বিজ্ঞান সম্মত নাম Spirobranchus giganteus

* * * * * *

ফার্মাসিস্ট
pharmacist.gautam@gmail.com

আগুন জ্বলছে: ধোঁয়া কই?

অমিত কৃষ্ণ দে: ভেবে দেখুন স্টোভে আগুন জ্বলছে কিন্তু ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। এই ঘটনা ঘটে চলেছে পুনে শহরের কয়েকটি গ্রামে যেখানে এক ধরনের রান্নার স্টোভ ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে আগুন জ্বলছে কিন্তু ধোঁয়া হচ্ছে না। এই স্টোভ তৈরি করেছে এপ্রোপ্রিয়েট রুরাল টেকনোলজি ইনস্টিটিউট (এআরটিআই) যা মহারাষ্ট্রের পুনে শহরে অবস্থিত।

এই স্টোভে চারটি থাক আছে, একটিতে ডাল রান্না করার জন্য, একটিতে ভাত, একটি সবজি ও একটিতে রুটি করার জন্য। উনুনের বদলে স্টোভ ব্যবহার করে দেখা গেছে রান্নার সময় কমে অর্ধেক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনরকম ধোঁয়া থেকে দূষণ

হচ্ছে না। দামি দামি গাছ কেটে এনে আগে আগুন ধরানো হত। ঐ স্টোভগুলি ব্যবহার করার পর থেকে কাঠ কাটা প্রায় ৪০শতাংশ কমে গেছে। অন্যদিকে রান্না করা ভাত রুটি ও সবজিতে আর ধোয়া গন্ধ লাগছেনা।

প্রথাগত কাঠের বা কয়লার উনুনের ধোঁয়ায় থাকে কার্বন-মনোক্সাইড ও বিভিন্ন ক্যান্সার রোগ সৃষ্টিকারী পদার্থ যেমন বেনজোপাইরিন ইত্যাদি। উনুনে রান্না করার সময় রান্নাঘরের ধোঁয়া ভর্তি হয়ে যায় এবং যারা রান্না করেন তাদের চোখ জলে ও শ্বাসনালীর ক্ষতি হয়। বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে যেখানে রান্নার গ্যাস পৌঁছয়নি বা গ্যাস কেনার সামর্থ নেই, সেই সব জায়গায় এখন কয়লা ও কাঠের উনুন ব্যবহার হোয়ে চলছে। সেই সব জায়গায় সরকার থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে এমন ভাবে উনুন তৈরি করে দিতে যাতে বেশি কয়লা বা কাঠ লাগবে না ও ধোঁয়া থেকে দূষণ হবে না। এই ব্যাপারে এআরটিআই কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুমোদন পেয়ে এই স্টোভ তৈরীর কাজে হাত দিয়েছে। ২০১০ থেকে এরা এইসব যেখানে পৌঁছে দিয়েছে সেখানেই আন্তরিক সম্বর্ধনা পেয়েছে । আশা করি খুব শিগগিরই সারা ভারত-বর্ষের গ্রামগঞ্জে এইসব স্টোভ জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

উপদেষ্টা
ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস
অ্যাসোসিয়েশন
(ডিএস টি, গভ. অব ইন্ডিয়া)
ade59247@gmail.com

আমরা বুড়ো হই কেন

সুমন কল্যাণ মণ্ডল: সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার কথা আমরা ক'জন ভাবতে পারি? জীবনের রীতি মেনে বয়স বাড়ে। একটা দীর্ঘশ্বাস, একটা প্রশ্ন, অনেকটা হতাশা ইস যদি আর কিছুদিন এই মায়া জগতে কাটিয়ে দেওয়া যেত। অমরত্বের বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার শেষ নেই। তাঁদের নিরন্তর পরিশ্রম বিফলে যায় নি। অক্লান্ত গবেষণায় জানতে পেরেছেন বয়স বাড়ার জন্য দায়ি হল ক্রোমোজোমের টেলোমিয়ারের ক্ষয়। ক্রোমোজোম আর টেলোমিয়ারের বিষয়ে জানতে হলে ফিরে তাকাতে হবে জীবনের একক - কোষের দিকে। দু একটা ব্যতিক্রমি উদাহরণ ছাড়া কোষকে খালি চোখে দেখা যায় না। যেমন, ইটের পর ইট সাজিয়ে বাড়ি হয় তেমনি কোটি কোটি কোষ নিয়ম মাফিক সুসজ্জিত হয়ে জীবদেহ গঠন করে। এই কোষগুলি বার বার ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ নিজস্ব বিন্যাসে কলা ও কলা সুসজ্জিত হয়ে দেহের আকার দেয়। যে কোন ডিম হল সচরাচর খালি চোখে দেখতে পাওয়া কোষ। কোষের মধ্যে জীবনের ভিত্তি হিসাবে থাকে সান্দ্র তরল সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস। ডিমের কুসুম কিন্তু নিউক্লিয়াস নয়। কতকগুলো সুতোর মত ফিতে আকারে ডিএনএ থাকে গুটিয়ে লাটাইয়ের মত হয় এই লাটাই হল ক্রোমোজোম। ক্রোমোজোমকে সাধারন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়। প্রত্যেক প্রজাতিতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট ও আলাদা। মানব দেহে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে। ঘুড়ির লাটাইয়ের যেমন দুটি প্রান্ত থাকে তেমনি ক্রোমোজোমেরও দুটি প্রান্ত থাকে এটাই টেলোমিয়ার। টেলি মানে দূর অর্থাৎ দূরের অংশ। গবেষণায় দেখা গেছে কোষ থেকে নতুন কোষ তৈরির সময় এই টেলমিয়ার অংশে ভাঙন ঘটে ও কিছু অংশ নষ্ট হয়। টেলোমিয়ার যত নষ্ট হয় মানুষ তথা সমগ্র জীবকুল তত বৃদ্ধ হয়। এছাড়াও পুষ্টির অভাব, নিয়মিত কঠিন অসুখে ভুগলে টেলমিয়ারের ক্ষয় বেড়ে যেতে পারে। কাউকে অল্প বয়সে বুড়ো দেখলে বুঝতে হবে এদের শরীরে টেলমিয়ারের ক্ষয়ের হার অত্যধিক বেশি। বৃদ্ধ হওয়ার কারণ তো জানা গেল। তবে অমরত্ব কোথা থেকে আসবে? বিজ্ঞানীদের কাছে তা এখনও অধরা। তবে, আশায় বুক বাঁধতে ক্ষতি কি? যেতে তো একদিন হবেই। যাঁরা স্বেচ্ছায় পৃথিবী ছেড়ে যেতে চান তাঁরা ভেবে দেখতে পারেন। কারণ এই আলো-ছায়ার রঙিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সুযোগ একবারই আসে।

যা সাধারন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় না। ডিএনএ'র সমষ্টিগত আধার হল নিউক্লিয়াস। নতুন কোষ তৈরির সময় ডিএনএ গুলি

সুমন কল্যাণ মণ্ডল
কলকাতা
smsmonkol@gmail.com

নতুন কোভিড সতর্কতা বিধি প্রয়োগ করার সময় কি এসেছে?

অনির্বাণ মিত্র: এপ্রিল, ২০২২, থেকে বেশিরভাগ কোভিড সতর্কতা বিধি সরকারিভাবে উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। না ওঠালেও কার্যক্ষেত্রে নিয়মাবলী খুব যে একটা মানা হচ্ছিল তা নয়, কিন্তু সরকারিভাবে তুলে দেওয়া মানে 'দি এন্ড'. এই অবস্থায় আমাদের একটি threat assessment করলে মন্দ হয় না। দু' বছর বিশ্বব্যাপী তুমুল গবেষণার পরে ভবিষ্যৎ নিয়ে কি বলা যায় তার একটা তালিকা করা যাক।

১. করোনা ভাইরাস কোনদিন নিশ্চিহ্ন হবে না। বস্তুত,

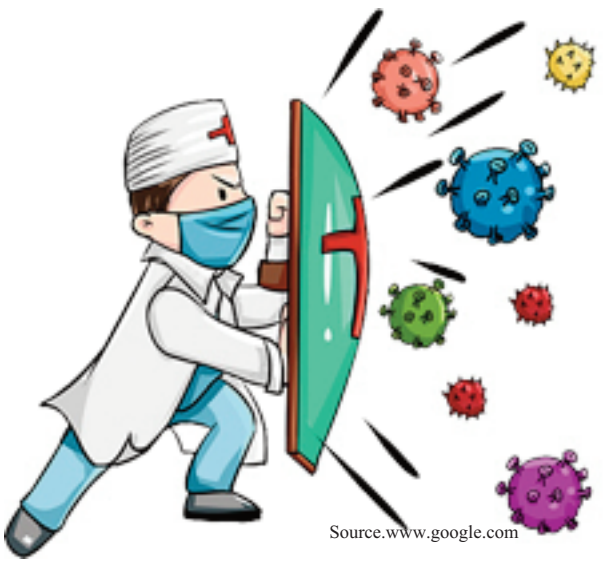

করোনা এমন এক ভাইরাস যা মানুষ ছাড়াও বহু প্রাণীর মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। একে নির্মূল করা কার্যত অসম্ভব। সুতরাং করোনা থাকবে আর কোভিড-১৯ও থাকবে।

২. তার মানে এই নয় যে আমরা আতঙ্কে ভুগব। প্রথমত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কারণে তা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। দ্বিতীয়ত, যত বড় গাইডলাইনই লেখা হোক না কেন, বাস্তবে বেশিরভাগ উপদেশ মানা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত আর সবচেয়ে বড় কথা-এই ভাইরাসকে আটকাতে দু-তিনটে পন্থাই যথেষ্ঠ। তার বাইরে সবই টাকা নষ্ট, সময় নষ্ট, এবং পন্ডশ্রম। সোজা কথায়, ২০২০ র মত নয়, ২০২২এ করোনা ঠেকাতে আমাদের মূল রসদ গত দুবছরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল।

৩. প্রথমেই অবধারিত প্রশ্ন - করোনাভাইরাস কি ভাবে ছড়ায়? উত্তর - আক্রান্ত ব্যক্তির নিঃশ্বাস দিয়ে নিঃসৃত এরোসলের মাধ্যমে। সেই ভাইরাস-ভরা এরোসল বাতাসে বহুক্ষণ ভেসে থাকে এবং সুস্থ ব্যক্তির নাক মুখ দিয়ে ঢোকে। কিন্তু একটা বা দশটা ভাইরাস ঢুকলে সংক্রমণ হয় না , অন্তত কয়েক হাজার (বা কয়েক লক্ষ) ভাইরাসকে ঢুকতে হবে। এরা একা নয়, ঝাঁকে ঝাঁকে আক্রমণ করলে তবেই সফল হয়।

৪. এই বায়ুবাহিত শত্রু ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণ আটকাতে হলে এই ভাইরাসদের প্রোডাকশন ভাল রকম কমাতে হবে, খ) পরিবেশে এদের 'ঝাঁক'কে দূর্বল করে দিতে হবে; বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় viral density/concentration কমিয়ে দিতে হবে, এবং গ) যেসব জায়গায় ারৎধষ ফবহংরঃু কমানো সম্ভব নয় সেখানে এদের সামনে মাস্কের 'প্রাচীর' খাড়া করতে হবে।

৫. ভাইরাস প্রোডাকশন বন্ধ মানে অসুস্থতা কমানো। কারণ, এই ভাইরাস অসুস্থ দেহেই তৈরী হয়। এর corollary হল শরীর যত দ্রুত সেরে ওঠে নিঃসৃত ভাইরাসের সংখ্যা তত কমতে থাকে। অসুস্থতার মাত্রা কমানোর উপায় - টিকাকরণ (যা প্রাথমিক বাধা কাটিয়ে বেশ সাফল্যের সঙ্গেই হয়েছে, বুস্টারের আরো প্রচার জরুরি) এবং রুগীর সঠিক দ্রুত চিকিৎসা।

৬. নাকে মুখের কাছে বাতাসে viral density কমাবার সহজ উপায় হল বাতাসের পরিমাণ (volume) বাড়িয়ে দেওয়া। সেই জন্যেই প্রচন্ড ভিড় ছাড়া outdoor এ সংক্রমণ খুবই কম হয় - এটা সারা পৃথিবীতেই দেখা গেছে। করোনা মূলত ঘরের মধ্যে সংক্রমণ করে, বিশেষত এমন indoor যেখানে অঈ চলছে বলে জানলা-দরজা বন্ধ, এবং বন্ধ পরিবেশে বাতাসের volume অপরিবর্তিত। সেখানেই viral density বেড়ে ওঠার বেশি সম্ভাবনা এবং সংক্রমণ

করতে সুবিধে।

৭. উপায়? খুব সহজ - জানলা দরজা খুলে দিন। Outdoor বাতাস আর রহ-door বাতাস যেন অনেকটা মিলে মিশে যায়. যার ফলে ভাইরাসের ঘনত্ব কমবে, এবং তার ফলে সংক্রমিত হবার সম্ভাবনাও কমবে।

৮. কিন্তু, মাস্ক? পরতে হবে, কিন্তু সবসময় না। এবার প্রয়োজন এসেছে smart maskingএর। একজন তেমন-ভিড়-নেই রাস্তায় হাঁটছে, বা সাইকেল বাইক স্কুটার চালাচ্ছে, বা অটো বা জানালা-খোলা ট্যাক্সিতে চলছে তখন কি চারপাশে অনেক হওয়া বইছে না? তাহলে সেখানে viral density হ্রাস পাবে কি করে? অর্থাৎ, আউটডোর পরিবেশে এবং জানলা-দরজা খোলা এমন ইন্ডোর পরিবেশে মাস্ক পরার তেমন দরকার নেই।

৯. তাহলে মাস্ক কোথায় প্রয়োজন? এমন ইনডোর পরিবেশ যেখানে জানলা দরজা বন্ধ, যেখানে অনেক অজানা অচেনা মানুষের যাতায়াত আছে - অর্থাৎ আধুনিক বাতানুকূল অফিস, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, ক্লাসরুম, মল, বড় দোকান, মেট্রো রেল, ভিড় বাস, ট্রাম, এসি ক্যাব, রেস্তোরাঁ, বা পাবলিক টয়লেট।

১০. আর জানলা না খুললে আর মাস্ক না পরলে? তাহলে ভাইরাসের সুবিধে হবে। এখন সবাই নতুন নতুন ভ্যাকসিন পেয়েছি বলে বেশি হয়ত অসুখ করবে না (যদিও বয়স্করা বিপদসীমার কাছাকাছিই থাকবেন), কিন্তু যত সময় যাবে...? আসলে, অন্তত চারটি বৈজ্ঞানিক সার্ভে অনুযায়ী যে অসুখে ১.৮-২.৫ কোটি মানুষ মারা গেছেন তার সঙ্গে আর যাইহোক ছেলেখেলা করা চলে না, চলবেও না।

১১. আর স্যানিটাইজেশন? আসলে করোনা তো কলেরা টাইফয়েড আন্ত্রিকের মত জীবাণু নয় যে হাত না ধুলে বা অস্বাস্থ্যকর খাবার বা জলের মাধ্যমে ঢুকে পড়বে।

এ ব্যাপারেও এখন বিজ্ঞানী-মহল মোটামুটি নিশ্চিত যে sanitize করে বায়ুবাহিত ভাইরাস আটকানো যায় না। তাই, অতিমারী-পূর্ব হাইজিনের বেশি কিছু দরকার নেই। তবে এখন দরকার দু' বছরের 'অভ্যাস আর প্রচার'। তা কি খুব কঠিন?

অনির্বাণ মিত্র
বায়োটেকনোলজি বিভাগ,
ইনস্টিটিউট অফ
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং,
বাদু, কলকাতা
informanirbanmitra@
gmail.com

ডিসবায়োসিস

স্বপন ভট্টাচার্য: সাম্প্রতিক গবেষণা জানাচ্ছে অন্ত্রের জীবাণুজগতের ধরনটা কেমন হবে তার সূচনা হয়ে যায় গর্ভাবস্থায়। আগে ধারণা ছিল মাতৃগর্ভ হল স্টেরাইল - নির্বীজ। কিন্তু গর্ভের তরলে, গর্ভনাড়ীতে, ভ্রূণের আবরণীতে ব্যাকটেরিয়ার ডি এন এ-র উপস্থিতি সে ধারণা ভেঙে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এও জানা যাচ্ছে যে নবজাত শিশুর দেহের জীবাণুজগত ঠিক কেমন হবে তা নির্ভর করবে কিভাবে সে ভূমিষ্ঠ হল তার উপর। দেখা যাচ্ছে, স্বাভাবিক ডেলিভারির বাচ্চার দেহের জীবাণুতন্ত্র সিজারিয়ান ডেলিভারির বাচ্চার তুলনায় বেশ অন্য রকম হয়।

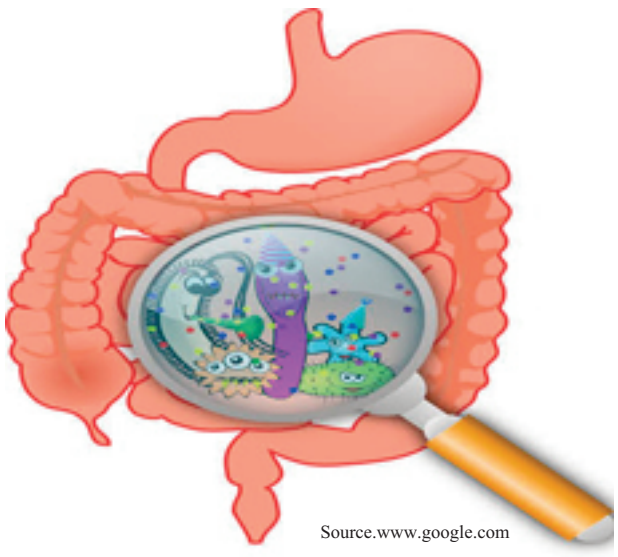
Source.www.google.com

পরিণত মানুষের অন্ত্রে দুটি গোষ্ঠীর ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি মানুষের অন্ত্রে প্রায় সার্বজনীন – Bacteroidetes I Firmicutes । কতটা উপকার এই অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়াকলাপ থেকে পায় স্তন্যপায়ী প্রাণি তা দেখার জন্য ব্যাকটেরিয়া-বিহীন ইঁদুরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছিল যে তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বজায় রাখার তাদের ক্যালোরি চাহিদা ছিল অন্তত ৩০ শতাংশ বেশি। আবার তাদের পৌষ্টিকতন্ত্রের জীবাণুবৈচিত্র বাইরে থেকে স্বাভাবিক করে দিলে সে চাহিদাও স্বাভাবিক স্তরে নেমে এসেছিল।

আধুনিক গবেষণা বলছে পেটের মধ্যে থাকা ব্যাকটেরিয়া কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও বিকাশে, ইমিউনিটির প্রকৃতি নির্ধারণ করতে, শৈশব থেকে বয়ঃসন্ধি, বয়ঃসন্ধি থেকে যৌবনপ্রাপ্তি, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যে পৌঁছানোর বিভিন্ন ধাপকে স্বাভাবিকভাবে অতিক্রম করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। এই তন্ত্র বিপর্যস্ত হলে সেই অবস্থাকে বলে ডিসবায়োসিস। টাইপ ও এবং টাইপ ওও ডায়াবেটিস, কোলন এবং রেকটাল ক্যান্সারের এবং ইনফ্ল্যামেটরি বাওয়েল ডিসিসের (ওইউ) মত বেশ কয়েকরকম রোগলক্ষণের সঙ্গে ডিসবায়োসিসের সম্পর্ক ধরা পড়েছে। থাইরয়েড গ্রন্থিজনিত রোগ গ্রেভস ডিজিজ অথবা হাশিমোতোর থাইরয়েডাইটিস রোগে ভোগে যারা, তাদের পেটের জীবাণুতন্ত্র স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় বেশ অন্যরকম এবং ডায়েট বদলে তা সংশোধন করে দেওয়া যায়। যেমন Sutterella নামের একটা ব্যাকটেরিয়া এদের ক্ষেত্রে খুব উপকারি হতে পারে। এছাড়া অন্ত্রের ভুল ব্যাকটেরিয়া থেকে ছুলি বা সোরিয়াসিস, অটোইমিউনিটিঘটিত রোগ ক্রন'স ডিজিজ এমন কি মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস হবার সম্ভাবনা প্রমাণিত হয়েছে।

সাইকোসিস অর্থাৎ মানসিক অস্থিতাবস্থার কারণ হিসেবেও চিহ্নিত হয়েছে পেটের ডিসবায়োসিস বা জীবাণু অসাম্য। মনের রোগীদের পেটে সুস্থ রোগীর পেট থেকে মাইক্রোবায়োটা ট্রান্সফার করে উপসর্গ কমিয়ে দেবার নজিরও আছে। অতএব, অর্গ্যান ট্রান্সফারের মত মাইক্রোবায়োটা ট্রান্সফারও চিকিৎসার অঙ্গ হয়ে উঠছে।

প্রাক্তন প্রধান,
মাইক্রোবায়োলজি
মৌলানা আজাদ কলেজ,
কলকাতা
swapanbmac@gmail.com

যা খেলে ভালো থাকা যায় (প্রথম পর্ব)

মীনাক্ষী দে: বিজ্ঞান তো থেমে থাকে না, এগিয়েই চলেছে। ফলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও অনেক পরিবর্তন হচ্ছে। এমনকি খাদ্যাভ্যাসেও। অনেক ফল, মূল, শাক, সব্জি আছে যেগুলোর গুণাগুণ আমরা জানি না। তাদের মধ্যে যে প্রাণশক্তি বর্তমান সেকথাও আমাদের অজানা। আজ বোধ হয় বিশ্বের নতুন পরিস্থিতিতে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকা নিয়ে নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এখন আমাদের সকলেরই দায়িত্ব সহজলভ্য এবং সহজপাচ্য এধরণের কিছু খাদ্যাবলীর সম্পর্কে জানা। এই বিষয়ে সাম্প্রতিক গবেষণাও অনেক নতুন ইঙ্গিত দিয়েছে।

ঝিঙে: স্বাদে খুব একটা আকর্ষণীয় না হলেও ওজন কমাতে ও চোখ ভালো রাখতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে খুব উপকারী। এতে প্রচুর পরিমাণে বিটা ক্যারোটিন বা ভিটামিন এ থাকে যা অপটিক নার্ভ গুলিকে ভালো রাখে।বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থ থেকে চোখের রক্তনালীগুলোকে রক্ষা করে। ঝিঙেতে আছে আয়রন তাই নিয়মিত খেলে রক্তাল্পতার রোগীরা ভালো থাকে । তা ছাড়াও আছে ভিটামিন বি সিক্স যা রক্তসঞ্চালন ভালো রাখে। ঝিঙে ওজন কমাতেও সাহায্য করে। এখানে ফ্যাট ও ক্ষতিকর কোলেস্টেরল নামমাত্র পরিমাণে থাকে। তা ছাড়াও আছে ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট নামক এক প্রকার উপাদান যা ডায়াবেটিস কমাতে সাহায্য করে ষ ঝিঙে কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়। এখানে আছে প্রচুর পরিমাণ জলীয় পদার্থ আছে, আছে সেলুলোজ। এক চামচ মধু দিয়ে এক কাপ ঝিঙের রস নিয়মিত পান করলে কোষ্ঠকাঠিন্য কমে ও পেট ভালো থাকে। ঝিঙে লিভারকেও ভালো রাখে। পিত্তরসের ক্ষরণ ভালো করে তাই জন্ডিস থেকে সেরে উঠার সময় ঝিঙে খেতে বলা হয়।

লঙ্কা: চোখ ভালো রাখে এখানে আছে ভিটামিন এ যা চোখের জন্য খুব উপকারী। রেটিনার কোষের ক্ষয় আটকায়, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায় ও প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। লঙ্কায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও সি থাকে যা নাসিকাপথ পরিষ্কার করে। অনেত্র, মূত্রনালী ও ফুসফুসে কোনো রকম সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়। বাতের ব্যথায় লঙ্কা দারুন কাজ করে। এখানকার উপাদান ক্যাপসাইসিন যেকোনো ধরনের পেশীর ব্যথা, দাঁতের ব্যথা ও অস্টিও আর্থ্রাইটিস-এর যন্ত্রণা কমায়। ঠান্ডা লেগে গলা ব্যথায় লঙ্কা খুব উপকারী। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় ও রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে। ধমনী প্রসারিত হয়, যার ফলে রক্তচাপ কমে, হৃদরোগের ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে যায়।

বাদাম: স্বাস্থ্যের দিক থেকে অনেক উপকারিতা আছে। প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আছে যা শরীরের কোষগুলোকে বিভিন্ন রোগ যেমন ক্যান্সার ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা করে। এখানে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই আছে যা রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করে ও কোলেস্টেরলের মাত্রাও কমিয়ে দেয়। শরীরের ওজন কমাতেও বাদামের অবদান আছে।

খেজুর: স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এর উপকারিতা অনেক। মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে খেজুর খুব উপকারী। গর্ভবতী মহিলাদের জন্য স্বাভাবিক-ভাবে প্রসবের ক্ষেত্রে খেজুরের অবদান আছে। খেজুরে আছে বিভিন্ন ধরনের পদার্থ যেমন ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম। তাই খেজুর হার সংক্রান্ত রোগ যেমন অস্টিওপোরোসিসকে আটকায় ও রক্তে শর্করার মাত্রা কমায়।

Source.www.google.com

প্রাক্তন অধ্যাপক
মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ
deminakshi1965@yahoo.com

এক অন্য গঙ্গার গল্প

শুভঙ্কর কুন্ডু: "গণি মিঞার ঘড়ি যেমন ঠিক সময় দেয়, কবিরাজশ্রেষ্ঠ নীলাম্বরের বড়ীও তেমনি অব্যর্থ"- এমনই প্রবাদ প্রচলিত ছিল আয়ুর্বেদাচার্য কবিরাজ নীলাম্বর সেন সম্পর্কে বঙ্গদেশে। তিনিই ছিলেন কুমারটুলির কবিরাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গপ্রসিদ্ধ কবিরাজশ্রেষ্ঠ পিতার তিনপুত্র গঙ্গাপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ, অন্নদাপ্রসাদ তিনজনই বাংলার বিখ্যাত কবিরাজ হলেও গঙ্গাপ্রসাদ ভারতপ্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক, সংস্কারক ও প্রচারক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

১২৩১ বঙ্গাব্দের ২রা ভাদ্র সোমবার ঢাকা বিক্রমপুর পদ্মাতীরবর্তী কোমরপুর গ্রামে গঙ্গাপ্রসাদের জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর পিতার পা ধরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বাবা এখন আমাদের কী হইবে?' তাঁর পিতা সহাস্যমুখে তাঁকে আশীর্বাদপূর্বক বলেছিলেন, 'প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু একদিন আসবেই, তাহাতে অভিভূত হইতে নাই। কোনো চিন্তা করিও না, তুমি চিকিৎসা জগতে একদিন সম্রাটের স্থান লাভ করিবে'। তাঁর পিতার এই ভবিষ্যৎবাণী যে কতটা সত্যি হয়েছিল তা পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে খ্যাতি তা প্রমাণ করে দেয়।

ঊনবিংশ শতকে বঙ্গদেশে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকদের মধ্যে দুটি ধারার কথা আমরা জানতে পারি, গঙ্গাধর রায়কে কেন্দ্র করে 'গঙ্গাধরী ধারা' আর গঙ্গাপ্রসাদকে কেন্দ্র করে 'গঙ্গাপ্রসাদী ধারা'। গঙ্গাধরের কর্মস্থল ছিল মুর্শিদাবাদ আর গঙ্গাপ্রসাদের ছিল কলকাতা। বঙ্গদেশে আয়ুর্বেদচর্চার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গঙ্গাধর আয়ুর্বেদীয় সূত্রগুলি বৈদিক চিন্তাধারার অনুসরণে ব্যাখ্যা করলেন, অপরদিকে গঙ্গাপ্রসাদ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রাচীন ও নবীন পদ্ধতির জীবন্ত ধারা প্রবাহিত করলেন। যখন ইংরেজদের হাত ধরে এদেশে পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবেশ করতে শুরু করেছে, তখন তিনি আয়ুর্বেদচর্চাকে পশ্চিমী চিকিৎসার সমপর্যায়ে উন্নীত করলেন। দরিদ্র জনগণ জানতেন গঙ্গাতীরে গঙ্গার প্রসাদরূপে গঙ্গাপ্রসাদ এসেছেন। দরিদ্রের অন্ন, শিক্ষা,চিকিৎসা,পথ্য সবই এই গঙ্গাপ্রসাদের গৃহে সহজপ্রাপ্য। আয়ুর্বেদ চিকিৎসার প্রচারের জন্য তিনি ১২৯১ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাস থেকে 'আয়ুর্বেদ সঞ্জীবনী' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তিনি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ব্যাবস্থাকে অর্থকরী বিদ্যায় পরিণত করার চেষ্টা করলেন, যাতে বাংলায় ডাক্তারদের পাশাপাশি কবিরাজদের তাঁদের সমপর্যায়ভুক্ত মর্যাদায় গণ্য করা হয়। চিকিৎসাজগতে এটি ছিল গঙ্গাপ্রসাদের বড় অবদান।

কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী 'পঞ্চতীর্থ' পত্রিকায় কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রবন্ধে (১৩৬১ বঙ্গাব্দের ৪ঠা চৈত্র) লিখেছেন, 'দীনদশাপন্ন কবিরাজ সমাজের আত্মমর্যাদা

Source.www.google.com

পুনরুদ্ধার ও যুগোপযোগী সংস্কার সাধনা তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত ছিল। তিনি কবিরাজবৃত্তিকে অর্থকরী না করিয়া গেলে আজ কবিরাজ সম্প্রদায় পাশ্চাত্য অর্থপ্রদান যুগে স্বদেশে ও সমাজে শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারিত না। বর্তমানে যে সকল উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণ কবিরাজী চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন,তাঁহারা দূরে থাকিয়াই উহার প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টি দিতেন। হিন্দুর চিকিৎসা হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী হওয়াই উচিত ইহা কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সকলেই এক্ষণে বুঝিতেছেন'।

তিনি প্রায় ৫০ বছর ধরে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রকে পাথেয় করে আয়ুর্বেদের যশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন এবং অন্য চিকিৎসকের পরিত্যক্ত বহু রোগীকে চিকিৎসা করে সাধারণ মানুষের মনে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি বিশ্বাস আনতে সক্ষম হন। তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট শিষ্যপ্রশিষ্যর নাম উল্লেখ করা যায়, যাঁরা তাঁর চিকিৎসা ধারাকে অব্যাহত রাখেন। প্রথম প্রজন্ম কবিরাজ নিশিকান্ত সেন, কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন, কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ। দ্বিতীয় প্রজন্ম বিজয়রত্নের শিষ্য হিসেবে কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়, বিরজাচরণ গুপ্ত, দুর্গাদাস ভট্ট ছিলেন উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ এবং গঙ্গাপ্রসাদ ছিলেন কলকাতার মধ্যে একজন বিখ্যাত কবিরাজ যিনি প্রত্যেকদিন বহু রোগীকে বিনামূল্যে ওষুধ দিতেন, ১৮৭৭ সালে তাঁকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামাঙ্কিত শংসাপত্র দেওয়া হয়, যা ছিল তৎকালীন সময়ে এক বিরল সম্মান।

ভারতপ্রসিদ্ধ এই মানুষটি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। শ্রীম কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থে গঙ্গাপ্রসাদ সম্পর্কে রামকৃষ্ণদেব বলেন, 'যখন আমার ভারী ব্যামো, গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে লয়ে গেলে তিনি বললে আপনি রাত্রে জল খাবেন না। আমি ঐকথা বেদবাক্য ধরে রেখেছি। আমি জানি তিনি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী'। তাঁর স্বদেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল নিদর্শন দিয়ে আলোচনার ইতি টানব। ১৮৯৯ সালে সাপ্তাহিক পত্রিকা বঙ্গবাসী রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত হলে, তিনি একলক্ষ টাকা জরিমানা দিয়ে পত্রিকার সত্ত্বাধিকারী, সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রকগণকে কারাগার থেকে মুক্ত করে আনেন। দেশ ও মাতৃভাষা তথা মাতৃবিদ্যার উপর যথার্থ অনুরাগ তাঁকে নিঃস্বার্থ দেশপ্রমিক করে তোলে। ১৩০২ বঙ্গাব্দের ২৪শে অগ্রহায়ণ সোমবার তিনি মারা যান।

এম ফিল গবেষক
ইতিহাস বিভাগ,কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
shubhankar1996kundu@gmail.com

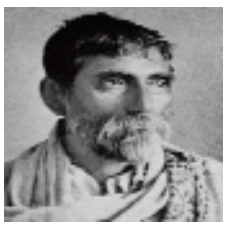

বিজ্ঞান কথন

কলকাতা/ এপ্রিল ২২, ২০২২, শুক্রবার, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

>>১ ধরিত্রী দিবস...

বাড়াতে প্রয়াসী হবে ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে। ছাত্রদের ক্লাস শেষ আর চূড়ান্ত পরীক্ষার মাঝে একটা দিন ছিল এই ২২ এপ্রিল। ছাত্রদের প্রাণশক্তিতে ভর দিয়ে, প্রায় দু'কোটি মানুষের সপ্রাণ অংশগ্রহণে শুরু হল পরিবেশ চেতনার এক নতুন ইতিহাস। পৃথিবী দিবস দেখিয়ে দিল পরিবেশের প্রশ্নে একজোট হতে পারে রিপাবলকান আর ডেমোক্র্যাটরা। ইতিমধ্যে আমেরিকায় রাষ্ট্রীয়

Source.www.google.com

তরফেও পরিবেশে নজর দেওয়া শুরু হয়েছে। ১৯৭০এর ১ জানুয়ারি ঘোষিত হয়েছে ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট পলিসি অ্যাক্ট।

আমেরিকার জাতীয় স্তরে দু'দশক ধরে নিয়মিত উদযাপনের পরে, ১৯৯০ সাল থেকে পৃথিবী দিবস পালিত হতে শুরু করল পৃথিবীজুড়ে। তার দু'বছর পরে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে বসল রাষ্ট্রসংঘের 'আর্থ সামিট' বা বসুন্ধরা সম্মেলন। এদিকে পৃথিবী দিবসের প্রণেতা নেলসন তাঁর অবদানের জন্য পেলেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতির পদক। ২০০৯ সালে রাষ্ট্রসংঘ ২২ এপ্রিল দিনটিকে ঘোষণা করল আন্তর্জাতিক 'মাদার আর্থ ডে' রূপে। 'আর্থ ডে' বা 'পৃথিবী দিবস', দেশের বেড়া টপকে পরিণত হল বিশ্বজোড়া 'মাদার আর্থ ডে' বা 'ধরিত্রী দিবস'-এ।

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়
সহযোগী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
sabya4@klyuniv.ac.in

>>১ পৃথিবী...

তবে আজ বিশ্ব বসুন্ধরা দিবসের পূণ্য তিথিতে ঐতিহাসিক বিবেচনায় একথা বলা যায় আবহ পরিবর্তনের বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে যুক্ত সভ্যতার উত্থান ও পতন। তাই সার্বজনীন ভাবে এই পৃথিবীকে বাঁচাতে দরকার 'সকলের তরে সকলে আমরা'র মতো সৎ চিন্তা এবং সময়, শিক্ষা,শ্রম ও দক্ষতার একনিষ্ঠ বিনিয়োগ। আমাদের সকলকে সম্মিলিত উদ্যোগে চেষ্টা করতে হবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর। যথা,--- ১. জনসংখ্যার স্থিতবস্থা, ২. সমন্বিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, ৩. সমৃদ্ধ শষ্যক্ষেত্র ও তৃণভূমি, ৪. বনভূমি ও প্রান্তিক ভূমির সবুজায়ন, ৫. জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ৬. পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির উন্নয়ন ও প্রচলন, ৭. জল ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ, ৮. সকলের জন্য পরিবেশ শিক্ষা ও সচেতনতা।

এছাড়াও আরও যে বিষয়টিতে আমাদের পূর্ণ বিনিয়োগ সেটা হলো--- পরিবেশ আইন সমূহের সংশোধন ও নবীকরণ।এ বিষয়ে স্টকহোম সম্মেলনের পর ১৯৭৩ সালে ভারতীয় সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে ৪৮এ ধারা অনুযায়ী--- "রাষ্ট্র পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নের প্রয়াস করবে এবং বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণী রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।" ভারতীয় সংবিধানের ৫১এ ধারায় মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে আছে : "বন,হ্রদ, নদী ও বন্যপ্রাণী সমেত প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা ও তার উন্নতি সাধন করা এবং সকল জীবিত প্রাণীর প্রতি সদয় হওয়া প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের কর্তব্য।"

এছাড়াও ভারত সরকার ১৯৮০ সালের ১লা নভেম্বর একটি পৃথক পরিবেশ বিভাগ দপ্তর এবং ১৯৮৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেট স্তরে একটি স্বাধীন পরিবেশ মন্ত্রক চালু করার মাধ্যমে পৃথিবীকে রক্ষা করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ হিসেবেও এই মহৎ উদ্দেশ্যে আমাদের পূর্ণ বিনিয়োগ জরুরী হয়ে পড়েছে।

তুহিন সাজ্জাদ সেখ
সায়েন্স কম্যুনিকেটর ও
প্রাক্তন ছাত্র
ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন
tsk2317563@yahoo.com

>>১ নব বেহুলা...

কিন্তু সে গাইটা ভি মরে গেলো।

এ কাহিনী উদেশ্বরের। এ যুগের "ভবম নাপিত"! আমাদের পাড়ায় ওদের সেলুন আছে। নাম "মুক্তকেশী"! প্রায় ৫০ বছর আগে তিন ভাই বাণেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর এবং উদেশ্বররা এই দোকান খুলেছিল। ভালোই চলছিল। পরে গঙ্গার ধারে "জটিয়া বাবা"র থানের গায়ে এবং তাঁরই আশীর্বাদে পাশের একটি গলিতেও আর একটি দোকান খোলে। গঙ্গার ধারে শবযাত্রীদের কাজটাও পাওয়া যায়। কিন্তু করোনার আগে থেকেই ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ, ভাগাভাগি। অনেক বন্ধু ছিল ওর যারা ওকে দোকানটা খুলতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু সেই বাণেশ্বরতো অতিরিক্ত মদ্যপানে চলেই গেল দোকানের সেই "জোশ"টাও যেন চলে গিয়েছে।

কোভিডের ভয়ে আমিও ওদের সেলুনে যাইনি। বাড়িতেই যথাসম্ভব সতর্কতা নিয়ে "ইটালিয়ান সেলুন" বানাই। তবে ইঁটের বদলে চেয়ার। এখন কি আর নীচুতে বসতে পারি? তবে আমার তো আর আন্দ্রে রাসেলের ছাঁট নয়। কাটতে কতক্ষণ লাগে? কাঁচির ক্যাঁচকোঁচ আর ওর ঠান্ডা স্বরে কথা বলা এক সঙ্গেই চলতে থাকে।

তো, এই রাজার বাবা ভূপিন্দর যাদব একবার ঠিক করলেন গ্রামে একঠো কালীমন্দির বানাবেন। ওনার প্রচুর পয়সা। একসাথে পচাস লাখ রূপিয়া দেবেন বলে কথা দিলেন। মন্দিরের চুড়াঠো এত উঁচা হবে যে তিনকোশ দূর থেকে দিখাই যাবে।

রাজাসাহাব খুব বাহার ঘুমতে ভালবাসতেন। সাথমে হর সময় আউর চার পাঁচ আদমি। সেবার গেলেন বোম্বাই। খুব বড়া হোটেলে উঠলেন। শুনলেন কি হোটেলটা বিক্রি হোবে। ডাকলেন মানিজারকে। বললেন, বাত করো। আপকো বিসোয়াস নেহি হোগা, উনি হোটেলটা কিনে নিলেন! ইসকে বাদ দেশে ফিরে এলেন। কুছ দিন বাদ ওনার তবিয়ত খারাব হল। অনেক ডাক্তার বদ্যি দিখালেন কিন্তু কুছু হলনা। উনি চলেই গেলেন। তো, আভি নয়া রাজাকে বারি। সব চিন্তা করে উনিই এই পচাস লাখ রূপিয়া দিয়ে দিলেন। বাকী টাকা গাঁওর সব লোক উঠায়ে দিবে এরকমই কথা হল। তো, আমাদের গ্রামে একটা মা মনসার মন্দির আছে। বহোৎ জাগ্রৎ! দুবেলা পূজো হয়। বহোৎ দূর দূর থেকে লোকে পূজো দিতে আসে। অনেকে মানত ভি করে। ইচ্ছাপূরণ ভি হয়। গ্রামে জঙ্গল আছে অনেক। সাঁপখোপ ভি আছে। প্রত্যেক বরষ সাঁপ কাটেও অনেক লোককে বাঢ়ের (বন্যার) সময় যখন তারা খেতির কামে লেগে থাকে।

একবার একঠো পন্দর সোল সালের লেড়কা এল ভাগলপুর থেকে। আমাদের এই গ্রামে ওর মামাবাড়ি। উনকা বহোৎ পেয়ারা ভাঞ্জা। লেকিন থোড়াসা জিদ্দি লেড়কা। আমাদের গ্রামে ধান, গেঁহু ছাড়া বহোৎ ভুট্টার চাস হয়। সেবারও বাঢ় হয়েছিল। জমিন জায়দাদ সব জলে ডুবে গেল। লেকিন ভুট্টা ভি কাটতে হবে। ও লেড়কা জিদ করল কি ও ভি মামার সঙ্গে ভুট্টা কাটবে। একদম নাছোড় বান্দা। বাধ্য হয়ে মামা ওকে লিয়ে গেল। আর সেখানেই ওকে সাঁপে কাটল। ভুট্টা ক্ষেতে লুকিয়েছিল। কি সাঁপ পাতা নেহি! ওর মামাতো ঐ বেঁহোস লেড়কাকে গাঁওমে লিয়ে এল। সারা গ্রামে হৈচৈ পড়ে গেল। সবলোক ছুটে দেখতে এল। একজন বতাল কি পাশের গাঁওয়ে এক ওঝা আছে। জড়িবুটি করে, ঝাড়ফুঁক ভি করে। তো বোলাও উনকো। কিন্তু উনকো ঘরমে মিলা নেহি। না জানে কঁহা গয়ে থে? উনার বাড়িতে বলা হোল কি এলেই তুরন্ত রঘুনাথপুর ভেজ দিবে। এদিকে লেড়কাটা লীল হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে। মরেই বোধহয় গেল! রোনাওনা ভি শুরু হয়ে গেল।

এহি সময় আউর এক আদমি বতাল কি উনকো মনসা মন্দিরে নিয়ে চল। তো, চলো সব। বীচমে লেড়কাকো মুর্দা যেইসি লাগ রহা থা। যেখানে মনসা পূজোর বড় মেলা হয় সেখানে এত ভীড় হয়ে গেল যে গাঁওয়ের রাজা সবকোইকো হঠে যেতে বলল। লেকিন ও লেড়কার মা বলল কি আমি যাবনা। কানছেতো কানছেই আর ছেলের শক্ত শরীলটা ধরে বসে আছে। কোই একজন বতাল যে লেড়কাকো ও মন্দিরকে মিট্টি খিলা দো। তো তাও ভি হোল। লেকিন কৈ ফয়দা নেহি দেখা। মা তব ভি ওখানে বইঠে রইল। গাঁও কা সব আদমি ও জাগা ফাঁকা কর দিয়া। রাত ভি বহোৎ হো গিয়া থা।

আমি উদেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলাম তারপর? আমারও উৎকণ্ঠা গলার কাছে। তব আজীবসা এক বাত হুয়া! আমিও সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, কেয়া? ভারি রাতমে ও মুর্দা লেড়কা উঠকে বৈঠ গিয়া! কেয়া-য়া-য়া? আপ বিশোয়াস নেহি মানতে হেঁ? এবার উদেশ্বরের প্রশ্ন!

হাঁ, সিরফ উনকা মাইয়াহি সাকসি থি। মনসামাতাকে দয়া পর ও লড়কা বাঁচ গয়া! বলে উদেশ্বর কাঁচি থামিয়ে মাথায় হাত ঠেকাল। অদৃশ্য দেবীর উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাল। গম্ভীর নিদকে বাদ উঠকে লেড়কাকা পহেলা সওয়াল এহি থা, হাম কাঁহা হ্যায়?
আমিও ভাবছি। আমরা কোথায় আছি?
এই কি আজাদি কা অমৃত মহোৎসব?

প্রশান্ত কুমার বসু
সাংবাদিক ও
বিশিষ্ট লেখক
সম্পাদক
সায়েন্টিফিকা কম্যুনিকা ও বিজ্ঞান কহন
boseprasanta@hotmail.com

সম্পাদকমন্ডলী

সম্পাদক: প্রশান্ত কুমার বসু
যুগ্ম সম্পাদক: অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

সদস্য: শ্রী পথিক গুহ, ড. নকুল পরাশর, ড . কে মুরলিধরন, ড. সুধেন্দু মণ্ডল, ড. মানস চক্রবর্তী, ড. বরুণ চ্যাটার্জি, ড. শ্যামল চক্রবর্তী, ড. অমিত কৃষ্ণ দে, ড. মানসপ্রতিম দাস, ড. সীমা মুখোপাধ্যায়, শ্রী দেবপ্রসন্ন সিংহা, ড. মীনাক্ষী দে, ড. বুড়োশিব দাশগুপ্ত, ড. শঙ্করাশিস মুখোপাধ্যায়, ড. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, ড. সুমিত্রা চৌধুরী, ড. কালিপ্রসন্ন ধাড়া, ড. আশিস দাস, শ্রীমতী অর্পিতা চক্রবর্তী ও শ্রী রাতুল দত্ত

কারিগরি উপদেষ্টা: শিব শঙ্কর দত্ত

সহযোগী সম্পাদক
সুকল্যাণ গাইন, বর্ণালি ভট্টাচার্য, তুহিন সাজ্জদ সেখ, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, তনুশ্রী দে, সূর্যানী চ্যাটার্জী, নিপা ব্যানার্জী, দেবশ্রী ঘোষ, জুনেদ জাভেদ, রিজায়ানা পারভিন, সুদীপ্ত ব্যানার্জী, বিভাস আদক, জিন্নাত আলি শেখ

নিবন্ধ পাঠানোর ই-মেল

bigyankahon@gmail.com

৩৪ তম ট্রেনিং পোগ্রাম অন সায়েন্স কমিনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া প্র্যাকটিস,
ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন,
৯২, এ পি সি রোড, কলকাতা ৭০০০০৯
-এর পক্ষে
ড. অমিত কৃষ্ণ দে ও ড. টি ভি ভেঙ্কটশরণ
কর্তৃক প্রকাশিত
ই-মেল- scie2224@dataone.in
website: www.scienceandculture-isna.org

© Copyright of ISNA can be reproduced with due acknowledgement to ISNA